শাইখ আনোয়ার আল আওলাকি

# বিজয়ের পথে মুসলিম উম্মাহ্

শাইখ আনোয়ার আল আওলাকি

(আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করুন এবং রক্ষা করুন)

শাইখ এর অডিও লেকচার "**Allah is preparing us for victory**" অবলম্বনে

**ডানপিটে মিডিয়া প্রকাশিত**

**ডানপিটে মিডিয়ার বিতরণ সংক্রান্ত বিশেষ অনুরোধঃ**

এই গ্রন্থের টিকাসহ যে কোন অংশে কোন প্রকার সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ব্যতিরেকে যে কোন ব্যাক্তি প্রকাশনাটি প্রচার বা বিতরণ করার নিঃশর্ত অধিকার রাখেন।

**ডানপিটে মিডিয়ার দায়ভার সংক্রান্ত স্বীকারোক্তিঃ**

ডানপিটে মিডিয়ার দায়িত্ব শুধু ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকবে যতটুকু এই গ্রন্থের লেখকের বক্তব্যের সাথে আমরা একমত পোষণ করে প্রকাশ করেছি। একই লেখকের অন্য কোন বক্তব্য বা উক্তি থেকে আমরা সম্পুর্ন দায় মুক্ত।

## সম্পাদকের কথা

রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেখে যাওয়া মুসলিম উম্মাহ্ আজ এমন এক ভয়াবহ সময় অতিক্রম করছে যা ঈমানদারদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্তকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ভয়াবহ এই জন্য নয় যে কুফ্ফার এবং মুনাফিকরা সম্মিলিতভাবে ইসলামকে ধ্বংসের এবং মুসলিমদের উপর যুল্মের সর্বোচ্চ চেষ্টায় সফল হচ্ছে বরং ভয়াবহ এইজন্য যে এই উম্মাহ্র আহ্লে ইলমের দাবিদাররা তাদের ভীরুতা উম্মাহ্র মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে এমন এক হীনমন্যতার সৃষ্টি করেছে যা অধিকাংশ ইসলাম প্রে মিদের মানতে বাধ্য করেছে যে মুসলমান এমনই একটি দুর্বল জাতি যারা ইসলামের বিজয়ের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত্ব উপায় অবলম্বনের অর্থাৎ জিহাদ নিয়ে চিন্তা করার শক্তিটুকুও রাখেনা, তাই বাতিলের সাথে আপোষই একমাত্র সমাধান। ফলশ্রুতিতে ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠেছে আপোষকামীদের অসংখ্য আন্দোলন যারা বাস্তবতাকে চোখের আড়ালে রেখে ব্যাক্তিশুদ্ধির নামে কেবল নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত কিছু কর্মকান্ডের মাঝেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে।

অন্যদিকে আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞ যে এই পরিস্থিতিতেও তিনি এই উম্মাহ্ র মাঝে কিছু সিংহ-হৃদয় আলেমের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যারা উম্মাহ্কে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পাওয়া আমানাত হিসেবেই গ্রহণ করেছেন এবং উম্মাহ্র সামনে সত্য গোপন করার মত ভয়াবহ খিয়ানাত করেননি । আমাদের পরিবার পরিজন তাদের জন্য কুরবান হোক এবং আল্লাহ্ তাদের হিফাজত করুন যাদের সংস্পর্শ মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের রয়েছে শতশত বছরের এমন একটি বীরত্বের ইতিহাস যা মানব সভ্যতা আর কখনোই দেখেনি। তাদের সাহচর্য্য আমাদের উজ্জীবিত করে ইসলামের শক্তি ও বিজয়ের উপর কৃত আল্লাহ্র ওয়াদার উপর ইয়াকিন করতে। আমরা জানি বিজয় শুধু ইসলামেরই এবং তা আল্লাহ্ মুসলমানদের হাত দিয়েই আনবেন, ইনশা আল্লাহ্। আল্লাহ্ বলেনঃ

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

অর্থাতঃ **"যুদ্ধ কর ওদরে সাথে, আল্লাহ্ তোমাদের হাতে ওদের শাস্তি দিবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।"** (সুরা তাওবাঃ ১৪)

এখন সিদ্ধান্তের সময়। আছো কেউ হবে সেই সাহসি হাত, যাকে আল্লাহ্ ব্যাবহার করবেন ওয়াদাকৃত সেই বিজয় ছিনিয়ে আনতে? কে আছো নওজোয়ান ভুলে তেল-পিঁয়াজ আর বিদ্যুত বিল, তুলে নিবে সাইফুল্লাহ্? কে আছো ভাই অশ্রু ছেড়ে রক্ত দিয়ে লিখবে ইতিহাস? জেনে রাখো ভাই বিজয় তোমার সন্নিকটে, এসো হাতে হাত ধরি কদম চালাই উড়াই মহা সম্মানের কেতন, হয়ে যাই কুফ্ ফার আর মুনাফিকের হৃদয় কাঁপানো এক এক জন ডানপিটে মুজাহিদ।

সম্পাদক

**ডানপিটে মিডিয়া**

# সূচিপত্র

## আল্লাহ তায়ালা যখন কিছু চান তখন তিনিই তার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ তৈরী করে দেনঃ

**اذا اراد الله شيئاً هيّئ له اسبابه**

**“আল্লাহ তায়ালা যখন কিছু চান তখন তিনিই তার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ তৈরী করে দেন।”**

উল্লেখিত এই মূলনীতিটি গ্রহণ করা হয়েছে ইমাম ইবনে আসীর রহঃ রচীত কালজয়ী ইতিহাস গ্রন্থ আল-কামিল থেকে। যার সারমর্ম হলো, আল্লাহ রব্বুল আলামীন যদি কখনো কোনো অবস্থার সমাপ্তি চান তাহলে তিনি এমন পরিস্থিতি ও উপায় উপকরণ তৈরী করবেন যা সবকিছুকে সেই সমাপ্তির দিকেই পরিচালিত করবে। তাই আল্লাহ তায়ালা যদি এই মুসলিম উম্মাহ্‌র বিজয় চান তাহলে তিনি এমন পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরী করবেন যা এই উম্মাহ্‌র বিজয়কে তরান্বিত করবে। আর সেক্ষেত্রে আপনারা (যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেছেন) বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি দেখেই বুঝতে পারবেন যে আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিম জাতির বিজয় এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আমরা যদি ধরে নেই যে ইমাম ইবনে আসীরের আই মুলনীতিটি সঠিক তাহলে আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হবো যে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ইনশা আল্লাহ সময়ের ব্যাপার মাত্র।

বিজয়ের ব্যাপারে আমরা যদি কোরআন ও সুন্নাহয় বর্ণীত সাধারণ মুলনীতিগুলোর দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাই যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোরআনে এই উম্মতের বিজয়ের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন এবং তার রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই উম্মাহ্‌কে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। অতএব এটা আমাদের ঈমান ও আকীদার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই উম্মাহ্‌ই অবশেষে বিজয়ী হবে; তাতে তাদের বর্তমান অবস্থা যা-ই হোকনা কেন। আর এই উম্মতের বিজয়ের ব্যাপারে আপনার মনে যদি কোনো সন্দেহ সংশয় থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার ঈমান আক্বীদায় নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে ; কেননা এ বিষয়ে কোরআন ও সুন্না হয় বিবৃত দলীলগুলো এতোই মযবুত ও সুস্পষ্ট যে বিষয়টিকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই।

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য আমি নিচে এ বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহর কিছু দলীল উপ স্থাপন করলামঃ

**وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ**

**লাওহে মাহফুযের পর সকল আসমানী কেতাবেও আমি একথা দিয়েছি যে , যমীনের উত্তরাধিকারী একমাত্র আমার নেককার বান্দারাই হবে।** *(সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ১০৫)*

অতএব ঘটনা পরিক্রমায় অবশেষে আল্লাহর নেককার বান্দারাই পৃথীবির উত্তরাধিকার লাভ করবে।

আলাহ আযযা ওয়া জাল্লা আরো বলেন-

**وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ**

**আমার বান্দা- রসূলদের ব্যাপারে আমার এ সিদ্ধান্ত অনেক আগে থেকেই হয়ে আছে যে, তাদেরকে নিশ্চয়ই (আমার পক্ষ থেকে) সাহায্য করা হবে এবং আমার বাহিনী নিশ্চয়ই বিজয়ী হবে।** *(সূরা আস সফফাত, আয়াত ১৭১-১৭৩)*

এখানে আল্লাহ তায়ালা নবী রসূলদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে বিজয় দান করবেন। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

**إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ**

**এ পৃথিবী তো আল্লাহ তায়ালারই, তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝ থেকে যাকে চান তাকেই এর (ক্ষমতার) উত্তরাধীকারী বানান। আর চূড়ান্ত শুভ পরিণতি কেবল মুত্তাকীদের জন্যেই নির্ধারিত।** *(সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ১২৮)*

এখানে আল্লাহ তায়ালা বলছেন তিনি সাময়িক সময়ের জন্য যে কাউকে পৃথিবীর নেতৃত্ব দিলেও চূড়ান্ত ভালো পরিণতি কেবল মুত্তাকিদের জন্যই ঘোষণা করেছেন। অন্য এক আয়াতে আল্লা তায়ালা বলছেন-

**يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ**

**তারা চায় তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর (দ্বীনের) নূরকে নিভিয়ে দিতে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান না করে কিছুতেই ছাড়বেন না, যদিও কাফেররা তা (চরমভাবে) অপছন্দ করবে।** *(সূরা আত তাওবা, আয়াত ৩২)*

আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে কাফেররা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে , আর আল্লাহর নূর হলো তার মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাহ। ইসলামের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য এমন কোনো হীন পন্থা নেই যা তারা অবলম্বন করছে না; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে এ কাজে তারা সর্বতভাবে ব্যার্থ হবে।

তারা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য যে পরিমান অর্থ খরচ করে তা যে কাউকে বিস্মিত করবে। আমরা হয়তো মনে করি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাদের কতো পাহাড় পরিমান সম্পদ দিয়েছেন! কতো উপায় উপকরণ তাদের করতলে! আর তারা এর সব কিছুকে ব্যায় করছে আল্লাহর দ্বীন ইসলামের পথ রুদ্ধ করার জন্য !

মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ লোকেরা আজকাল শুধু অনুযোগ করছে; তারা ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে যে 'আমরা তাদের সাথে কিভাবে মোকাবেলা করবো! পৃথিবীর যতো বড় বড় গণমাধ্যম , রেডিও টেলিভিশন, পত্র পত্রিকা, ইন্টারনেট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রযন্ত্র, আর্মি পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা সবই তারা নিয়ন্ত্রণ করে; এক কথায় গোটা বিশ্ব আজ তাদের করতলে। গোটা দুনিয়ার ধনভান্ডার আজ তাদের নিয়ন্ত্রণে; অতএব রণে ভংগ দেয়া ছাড়া

আমাদের আর কিছুই করার নেই। আর যদি আমরা কিছু করতেই চাই তাহলেও এমন কিছু করা ঠিক হবে না যা তাদের সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়। অতএব তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য নিশ্চই আমাদের বিকল্প কোনো নমনীয় পন্থা গ্রহণ করা উচিত; তাদেরকে মোকাবেলার জন্য আমাদের কেবল নরম ভাষায় দাওয়াত দেয়া উচিত, রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক প ন্থা গ্রহণ করা উচিত'। অথচ আমরা যদি আল্লাহর কুরআন মনোযোগ সহকারে পড়তাম তাহলে নিশ্চিত বুঝতে পারতাম যে , ইসলামকে প্রতিরোধের জন্য তাদের এই শত শত মিলিয়ন ডলার বাজেট দেখে আমাদের ঘাবড়ানোর কিছু নেই ; কারণ স্বয়ং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাদের সম্পর্কে বলেছেন-

فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

**তারা তাদের সম্পদ খরচ করতে থাকুক, এরপর এই খরচ করাটাই একদিন তাদের জন্য চরম আফসোসের কারণ হয়ে দাড়াবে; অতঃপর তারা পরাজিত হবে; আর অবশেষে কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে** *(সূরা আল আনফাল, আয়াত ৩৬)*

অতএব তাদেরকে তাদের কাড়ি কাড়ি টাকা, শত শত বিলিয়ন ডলার খরচ করতে দিন; কেননা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেছেন তারা প্রথমে তাদের অর্থবিত্ত ও সহায় সম্পদ খরচ করে নিঃস্ব হবে, অনুতপ্ত হবে অতঃপর তাদের উপর পারাজয়ের গ্লানী নেমে আসবে। সুতরাং আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে তাদেরকে তাদের সম্পদ খরচ করতে দেখে আমাদের খুশি হওয়া উচিত ; কেননা এর অর্থ হলো তাদের পরাজয় ঘনিয়ে আসছে এবং ইসলামের বিজয় অতি সন্নিকটে এবং অবধারিত।

তাদের অর্থনৈতিক রক্তক্ষরণের কথা এখন আর তারা নিজেরাই গোপন রাখতে পারছে না। এখন তারা নিজেরাই বলছে যে আফগান ও ইরাক যুদ্ধ তাদের জন্য ভিয়েতনাম ও কোরিয়া ন যুদ্ধের চেয়েও কতো বেশী ব্যায়বহুল হয়ে দাড়িয়েছে।

কোরিয়ান যুদ্ধে তাদের ব্যায় হয়েছে ২০০ বিলিয়ন ডলার, ভিয়েতনাম যুদ্ধে তাদের ব্যয় হয়েছে ৪০০ বিলিয়ন ডলার; ইরাক যুদ্ধে প্রায় ৮০০ বিলিয়ন ডলার তাদের ইতিমধ্যেই খরচ হয়েছে এবং আরো হচ্ছে। তাদের অর্থ খরচের বহর দেখে যে কেউ বু ঝতে পারবে যে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের কারণে অচিরেই তাদের অর্থনীতিতে ভয়াবহ ধস নামবে[1]। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহর আয়াতের বর্ণনার সাথে তাদের অবস্থা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। তারা এভাবে তাদের সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে খরচ করবে এবং তারপর তারা নিজেরাই হা হুতাশ করবে অনুশোচনা করবে। এটা তাদের হাতের কামাই , নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম; অতএব এর পরিণতি তাদেরকে ভোগ করতেই হবে; কারণ এই ইরাক ও আফগান যুদ্ধে আসার জন্য কেউ তাদেরকে বাধ্য করেনি ; বরং অন্যের পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া করার মতো তারা নিজেরা সেচ্ছায় এই যুদ্ধের আগুন জালিয়েছে। অতএব নিজেদের হাতে নিজেদের মৃত্যুকুপ খনন করার পরিণতি তারা শিঘ্রই টের পাবে। কিন্তু তখন তাদের আর কিছুই

---

[1] *ইতিপূর্বে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে অর্থ খরচের পরিণতিতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন আমরা দেখেছি; আর শায়খ পশ্চিমা বিশ্ব সম্পর্কে এ বক্তব্য দিয়েছিলেন বেশ কয়েক বছর পূর্বে, আর ইতিমধ্যে পশ্চিমা বিশ্ব সহ গোটা পৃথিবীতে যে অর্থনৈতিক মন্দা তথা ধ্বস আমরা দেখতে পেয়েছি তা শায়খের বক্তব্যকে বাস্তবে প্রমাণ করেছে। তাদের এ রক্তক্ষরণ এখনো চলছে এবং এর পর তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কেবলই পরাজয়ের গ্লানী। অনুবাদক*

করার থাকবে না। আল্লাহর আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী তারা তাদের সম্পদ খরচ করবে , অনুতপ্ত হবে এবং অতঃপর তারা সদলবলে পরাজিত হবে।

ঠিক যেমন তাদের অতিতের আদর্শ গুরু আবু জাহল মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বদরের ময়দানে এসে হাযির হয়েছিলো। অথচ যুদ্ধ করতে বদর ময়দানে আসার তার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। মুসলমানরা যে বানিজ্য বহরকে তাড়া করেছিলো তা নিরাপদ অবস্থানে চলে এসেছিলো। এমনকি বানিজ্য বহরের নেতৃত্বে থাকা আবু সুফিয়ান তাকে দুত মারফত পত্র পাঠিয়ে জানিয়েছিলো যে 'আপনারা মক্কায় ফিরে যান, আমি আমার বানিজ্য বহর রক্ষা করে এখন নিরাপদ অবস্থানে চলে এসেছি'।

কিন্তু আবু জাহল অহংকার প্রদর্শন করে বলেছিল, '**না, আমরা অবশ্যই যাবো এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবো ! আমরা বদর ময়দানে যাবো, সেখানে তিনদিন থেকে আনন্দ ফুর্তি করবো , সেখানে নর্তকিরা নেচে গেয়ে আমাদের মনোরঞ্জন করবে, আমরা মদ পান করবো; আমি চাই গোটা আরব বিশ্ব আমাদের যুদ্ধ যাত্রা র খবর শুনুক এবং জেনে নিক যে কুরায়শদের আত্নসম্মানে আঘাত করা কিছুতেই বরদাশত করা হবে না , বদর ময়দানে তিন দিন অবস্থান করে গোটা আরবে এই বার্তা পৌছে দেয়া হবে যে কুরায়শদের দিকে কেউ হাত বাড়ালে তা কিছুতেই সহ্য করা হবে না। অতএব কেউ যেন আর কোরায়শদের সাথে মোকাবেলা করার দুঃসাহস কোনো দিন না দেখায়'।** *(দেখুন বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত হাদীস ও সীরাত গ্রন্থের বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায় )*

এভাবেই সে দিনের আবু জাহল ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বদর ময়দানে এসেছিলো ; আর ঠিক এই একই পথ অবলম্বন করছে (বর্তমান সময়ের আবু জাহলদের ফোরাম ন্যাটো তথা ইউরোপ ও) আমেরিকা। তাদের উপর কোনো যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়নি; বরং তারা নিজেরাই এই এই যুদ্ধের আগুন জালিয়েছে , আর এর পরিণতি ইতিমধ্যে প্রকাশ পাওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। আর তাদের এই পরিণতি তো অবধারিত; আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণীত একটি হাদিসে কুদসীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

**من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب**

**'যে আমার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে আমি স্বয়ং (আল্লাহ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো'[2]।**

অতএব মনে রাখা দরকার যে মুসলমানরা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি বরং স্বয়ং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ; আমেরিকা গোটা বিশ্ব জাহানের মালিক স্বয়ং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন-

**وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ**

[2] *সহীহ আল বুখারী হাদিসে কুদসী অধ্যায়; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৩৪৭ ও ইমাম বায়হাকী তার সুনানুল কুবরায় হাদিসটি সংকলন করেছেন যার নাম্বার ২০৭৬৯ এবং ৬১৮৮, ইমাম আব্দুর রাযযাক তার মুসান্নাফে হাসান আল বসরী থেকে মুরসাল সুত্রে হাদিসটি সন্নিবেশিত করেছেন যার নাম্বার হল ২০৩০১।*

**তোমাদের মধ্য যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফাত দান করবেন, যেভাবে পুর্ববর্তীদেরকে তিনি খিলাফাত দান করেছিলেন, তাদের সেই জীবন ব্যবস্থাকে তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যে জীবন ব্যবস্থা তাদের জন্য তিনি মনোনীত করেছেন। এবং তাদের ভীতিকর অবস্থাকে তিনি নিরাপত্তা দ্বারা বদলে দিবেন। (শর্ত হলো,) তারা (জীবনের সকল ক্ষেত্রে) কেবল আমারই এবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। তবে এর পরেও যারা কুফরী করবে তারা হলো ফাসেক।** *(সূরা আন নূর, আয়াত ৫৫)*

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে খিলাফাহ তাদেরকে দেয়া হবে যারা সত্যিকার অর্থে ঈমানদার এবং যারা আমালুস সালিহা বা নেক আমল করে। বর্তমান সময়ে গোটা মুসলিম জাতি এক ভয়াবহ শংকা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করছে; আর আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা এখানে তাদেরকে নিরাপত্তা দানের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, এই উম্মাহকে খিলাফাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়ার ওয়াদা দিচ্ছেন।

## আল্লাহর রসূলের বাণীতে উম্মাহ্‌র কাল পরিক্রমা ও খিলাফাহর প্রত্যাবর্তনঃ

একটি হাদীস রয়েছে যে হাদিসটিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মুসলিম জাতির কাল পরিক্রমা কেমন হবে তার উপর বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ধারা বর্ণনা দিয়েছেন ; আমাদের প্রত্যেকের উচিত হাদিসটি সতর্কতা ও মনোযোগের সাথে পাঠ করা। হাদিসটিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

**تكون النبوّة فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها اذا شاء الله ان يّرفعها، ثمّ تكون خلافة على منهاج النّبوّة، فتكون ما شاء الله ان تكون، ثمّ يرفعهاا لله اذا شاء ان ّيرفعها، ثمّ تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله ان تكون، ثمّ يرفعهاا لله اذا شاء ان ّيرفعها، ثمّ تكون ملكاً جبريًّا فتكون ما شاء الله ان تكون، ثمّ يرفعهاا لله اذا شاء ان ّيرفعها ، ثمّ تكون خلافة على منهاج النّبوّة ثمّ سكت**

**নবুয়তের ধারা (অর্থাত আমার জীবনকাল) তোমাদের মধ্যে বলবৎ থাকবে যতোদিন আল্লাহ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ তাআলা সে নবুয়তের ধারা (আমাকে) তুলে নিবেন। তারপর আসবে নবুয়তের অনুসরণে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ, এই সময় বলবৎ থাকবে যতোদিন আল্লাহ চাইবেন, এরপর নেতৃত্ব আসবে রাজতন্ত্রের আদলে, এই ব্যবস্থা বহাল থাকবে যতোদিন আল্লাহ চাইবেন এবং তিনি চাইলে তার অবসান ঘটাবেন। এরপর আসবে যুলুমতন্ত্র, এটাও ততোদিন থাকবে যতোদিন তিনি চাইবেন, এরপর তিনি চাইলে এর অবসান ঘটাবেন। অতঃপর আবার আসবে নবুয়তের (উত্তম আদর্শের) অনুসরণে খিলাফাতে রাশেদা' একথা বলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকেন।**[3]

আলোচ্য হাদীসে যে নবুয়তের ধারার কথা বলা হয়েছে তা আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের সাথে সাথে সমাপ্ত হয়ে গেছে। এরপর তিনি যে খুলাফায়ে রাশেদার কথা বলেছেন তা আরম্ভ হয়েছে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর মাধ্যমে, আর তা সমাপ্ত হয়েছে হযরত আলি ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু এর খিলাফাতের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে। এরপর তিনি বলেছেন মুলকান যার অর্থ হলো রাজতন্ত্র আর এর বাস্তবায়ন হয়ে গেছে বনু উমাইয়্যা , বনু আব্বাস ও উসমানী খিলাফাতের মধ্য দিয়ে। এরপর তিনি যে যুলুমতন্ত্রের কথা বলেছেন তা হলো আমাদের বর্তমান সমসাময়িক কাল, এটাই হলো স্বৈরাচারী যুলুমতন্ত্র। এরপর আবার আসবে খিলাফাতে রাশেদা।

[3] *নুমান বিন বাশির রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় মুসনাদে আহমাদে সংকলিত, হুযায়ফা বিন ইয়ামান রাঃ সহ আরও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রাঃ থেকেও হাদিসটি বর্ণীত হয়েছে, ইমাম তয়ালেসী, বাযযার ও ইমাম তাবরানীও হাদিসটি সংকলন করেছেন; হাদিস বিশারদ ইমাম হায়সামী রহঃ বলেন এই হাদিসের বর্ণনাকারীরা সকলেই সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য।*

# বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে অভিযোগ না করাঃ

আমরা অনেক সময় (নিজের দায়িত্ব এড়ানোকে বৈধতা দেয়ার জন্য) আমাদের বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে অভিযোগের পর অভিযোগ দাড় করাতে থাকি। আমরা বলি যে 'আমরা ইতিহাসের সব চেয়ে নিকৃষ্ট সময়ের মধ্যে বসবাস করছি, মুসলিম উম্মাহ আজ মারাত্নক দুর্বল, মুসলিম উম্মাহ আজ সকল দিক থেকে পরাজিত পদানত, দলে উপদলে বিভক্ত, আহ! আমরা যদি সাহাবায়ে কেরামদের যুগে জন্ম নিতাম ! অন্তত ইসলামের সোনালী যুগের কোনো একটা সময়ে যদি জন্ম নিতাম তাহলে কতোই না ভালো হতো, কত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকাই না আমরা পালন করতে পারতাম!

এমন অভিযোগ করা আমাদের জন্য কেন মোটেই শোভনীয় নয় তার কিছু যৌক্তি কারণ নিচে তুলে ধরা হলো :

## *প্রথম কারণঃ*

কোনো একজন তাবেয়ী আল্লাহর নবীর একজন সাহাবীকে এক দিন বলছিলেন যে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপনাদের মাঝে ছিলেন তখন আপনারা তাকে কিভাবে সমাদর করতেন? তখন সে সাহাবী বললেন যে তারা কিভাবে আল্লাহর রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাদর করতেন এবং তিনি বললেন যে তারা আল্লাহর রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমাদরের ব্যাপারে তারা তাদের সামর্থের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করতেন। সাহাবীর কথার জবাবে তাবেয়ী বললেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাদের যুগে বেচে থাকতেন তাহলে আমরা তাকে কাঁধে তুলে রাখতাম।

এখানে আমরা তাবেয়ীর কথা একটু বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারবো , তিনি যেন বলতে চাচ্ছেন যে সাহাবায়ে কেরামগন আল্লাহর রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেননি এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাদের সময়ে বেচে থাকতেন তাহলে তারা সাহাবাদের চেয়ে আল্লাহর রসূলকে আরো বেশী সমাদর ও মর্যাদা দিতে পারতেন ! সাহাব রাযিয়ালল্লাহু আনহু তার জবাবে বলেন, সাহাবায়েকেরামগন আল্লাহর রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেমন মর্যাদা দিতেন, কেমন ভালবাসতেন, তারা দ্বীনের জন্য কেমন আত্নত্যগ স্বীকার করেছেন তা এমন কোনো ব্যক্তির পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে সে সময় উপস্থিত ছিলো না। আমাদেরকে আমাদের জন্মদাতা পিতা ও আপন ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে- এটা মোটেই সহজ কাজ ছিলো না; আর এখন তোমাদের পিতা মাতা ভাই ব্রাদার তথা পরিবারের সবাই হলো মুসলিম; আর তোমরা মনে করছো যে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের সময় বেচে থাকলে তোমরা আরো বেশী মর্যাদা দিতে! শোনো এমন কোনো কিছু (সম্মান বা দায়িত্ব) কামনা করো না যা আল্লাহ তোমাদের জন্য বরাদ্ধ করেননি।

*দ্বিতীয় কারণঃ*

আমাদের সময় সম্পর্কে আমাদের মোটেই অভিযোগ করা উচিত নয়; বরং আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা যে এই সময়ে পাঠিয়েছেন সে জন্য আমাদের আল্লাহর প্রতি আরো বেশী কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কেন আরো বেশী কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত আসুন তা ভেবে দেখি।

আমরা জানি যে গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা হলো সবার উর্দ্ধে। নবীদের পরে মানুষের পক্ষে সম্ভব সর্বোচ্চ আসনে তারা অধিষ্ঠিত , তাদের পরে রয়েছেন তাদের পরের প্রজন্ম তাবেয়ীগন এবং এরপর রয়েছে তাদের পরের প্রজন্ম তাবে তাবেয়ীগন। সাহাবায়েকেরামের মর্যাদা এতা বেশী হওয়ার অন্যতম কারণ হলো তারা মহান ইসলামের প্রাসাদকে শূন্য থেকে অস্তিত্বে এনেছেন , তাদের জান ও মালের কোরবানীর উপর নির্মিত হয়েছে ইসলামের প্রাসাদ। তারা যখন কাজ করেছেন তখন ইসলামের কিছুই প্রতিষ্ঠিত ছিলো না , তারা এই দ্বীনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তাদের পর যারাই এসেছেন তাদের সবার সামনে দ্বীনের প্রাসাদ নির্মিতই ছিলো, তারা হয়তো এই ভিত্তির সাথে এখানে ওখানে এক দু'টো উপাদান যোগ করেছেন; অথবা কালের আবর্তনে দ্বীনের আসল প্রাসাদের গায়ে বিদয়াত নামক আগাছা পরগাছা গজালে বা শেওলা ধরলে তা হয়তো কেটে কুটে ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করেছেন , কিন্ত দ্বীনের মুল প্রাসাদ তো সাহাবায়ে কেরামের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। অতএব সংস্কারক বা সৌন্দর্যবর্ধনকারী তো নিশ্চয়ই মুল প্রাসাদ নির্মাণকারির সমান মর্যাদা পেতে পারে না।

মোদ্দা কথা সাহাবায়ে কেরামের সর্ব্বোচ্চ মর্যাদা প্রাপ্তির কারণ হলো তাদের কাজটা ছিলো সব চেয়ে কঠীন কাজ এবং তারা সেটা আঞ্জাম দেয়ার জন্য তাদের পক্ষে সম্ভব সর্বোচ্চ কোরবাণী করেছেন।

পরিস্থিতির ব্যপারে অভিযোগ না করে আমরা যদি সত্যিই কিছু করতে চাই তাহলে আমাদের উচিত আমাদের সময়ের দাবী উপলব্ধি করা যাতে করে আমরা আমাদের দায়িত্বটা সঠিক ভাবে পালন করতে পারি। কারণ উম্মাহর পরিস্থিতি অনুযায়ী একেক সময়ে একেক ধরণের কাজ সময়ের দাবী হয়ে দাড়ায়; আর একারণেই দেখা যায় তাবেয়ীগন হয়তো গুরুত্ব আরোপ করেছেন এক বিষয়ের উপর তো তাবে তাবেয়ীগন গুরুত্ব আরোপ করেছেন অন্য বিষয়ের উপর। বিষয়টি আরো ভালো করে বোঝার জন্য নিচে আমি কিছু উপমা পেশ করছি।

ইমাম বোখারী রহঃ এর আবির্ভাব যদি আরো একশত বছর পরে হতো এবং তিনি যদি (হাদীস সংকলণের) সেই একই কাজ করতেন তাহলে নিশ্চয়ই উম্মতের মাঝে তার সেই অবস্থান ও মর্যাদা তৈরী হতো না যে মর্যাদা উম্মতের মাঝে এখন তার রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বা ইমাম আবু হানীফা রহঃ এর আবির্ভাব যদি আরো এক শতাব্দি পর হতো এবং তারা যদি (ফিকহী বিষয়ে গবেষণার) সেই একই কাজ করতেন তাহলে আমাদের মাঝে তাদের যে সতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে তা কিছুতেই থাকতো না। কারণ তাদের প্রত্যেকের সমকালীন প্রয়োজন ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। আর এভাবে সময়ের ব্যবধানের কারণে যুগে যুগে প্রয়োজনের ভিন্নতা তৈরী হওয়াটাই স্বাভাবিক।

আরো একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন যে ফিকহ শাস্ত্রের চারজন ইমামেরই আবির্ভাব হয়েছে একই শতাব্দিতে এবং হাদীস শাস্ত্রের ছয়জন ইমাম তথা ছিহাহ সিত্তার ছয়জন সংকলকের আবির্ভাবও একই শতাব্দির মধ্যে। এর কারণ হলো একটা সময়ে উম্মতের প্রয়োজন ছিলো ফিকহী মাসআলা মাসায়েলের উপর গবেষণা তো আরেকটা যুগের প্রয়োজন ছিলো আল্লাহর রসূলের হাদীসসমূহকে যাচাই বাছাই করে সংকলণ ও সংরক্ষণের।

এ বিষয়ের উপর আমার এতো কথা বলার কারণ হলো আমরা অনেক সময় আল্লাহর দ্বীন ইসলামের বিজয়ের জন্য কাজ করতে চাই কিন্তু ইসলামের বিজয়ের জন্য আল্লাহ তায়ালা কোন কাজটা করতে বলেছেন কিভাবে করতে বলেছেন তা সঠিকভাবে জানা না থাকার কারণে আমরা আমাদের অর্থ, সময়, মেধা শ্রম এমন কাজে ব্যয় করি যা বাস্তব অর্থে দ্বীনের কোনো কাজেই আসে না। তাই আমরা যদি সত্যিই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইখলাসের সাথে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে আগে জানতে হবে বর্তমান সময়ের জন্য কোন কাজটা সবচেয়ে বেশী জরুরী এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কোন কাজ করতে বলেছেন এবং বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আল্লাহর নির্দেশিত সেই কাজ কিভাবে সর্বোত্তম পন্থায় আঞ্জাম দেয়া যাবে।

আমরা দেখতে পাই যে আমাদের কিছু ভাইয়েরা শুধু দাওয়াতী কর্মক কাণ্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, আবার অন্য কিছু ভাইয়েরা রয়েছেন যারা শুধু ইলম অর্জনের পথে লেগে থাকতে বলেন। আমরা স্বীকার করি যে দাওয়ার কাজ করা ও ইলম অর্জন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং শুধু এ দুটো কাজই নয় বরং ইসলাম আমাদেরকে যতো কাজের আদেশ দিয়েছে স্ব স্ব স্থানে তার প্রত্যেকটারই গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আমরা যদি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটা ? তাহলে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের বর্তমান সময়টার সবচেয়ে বেশী মিল রয়েছে সরাসরি সাহাবায়ে কেরামদের সময়ের সাথে। কারণ বর্তমান মুসলিম উম্মাহ অধঃপতনের এতো প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছেছে যে আমাদের গোটা ১৪শত বসরের ইতিহাসে এই জাতি এতো নিচে নামেনি। আমরা আমাদের বর্তমান যে পরিস্থিতির ব্যাপারে শুধু অভিযোগ করি যদিও আক্ষরিক অর্থে হুবহু সাহাবায়ে কেরামদের সময়ের মতো নয় তথাপিও সার্বিক বিচারে আমরা দেখতে পাই যে, এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বেশী মিল রয়েছে সাহাবায়ে কেরামদের সময়ের সাথে। এই বক্তব্যের সমর্থনে যে যুক্তিগুলো তুলে ধরা যেতে পারে তা হলো -

ক. (মক্কী জীবনে) সাহাবায়ে কেরামগন যখন ইসলামের পথে এসেছেন তখন সমাজে মুসলমানদের কোনো নেতৃত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো না এবং বর্তমান সময়েও মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত কোনো নেতৃত্ব নেই ; অথচ একেবারে এমন নেতৃত্ব কর্তৃত্বহীন অব স্থা মুসলমানদের ১৪শত বসরের ইতিহাসে আর কখনো হয়নি।

খ. সাহাবায়ে কেরামদেরকে তাদেরকে বেষ্টন করে রাখা গোটা আরব সমাজ, তৎকালীন দুই পরাশক্তি রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য সহ চতুর্মুখী শত্রুদের মোকাবেলা করতে হয়েছে ; বর্তমান সময়েও এই একই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে; ঘরের শত্রু, বাইরের শত্রু সবাই মিলে আজ ইসলামের বিজয়কে রোধ করার জন্য একাট্টা হয়ে কোমর বেধে লেগেছে। এমন নাজুক পরি স্থিতি আমাদের ইতিহাসে কখনো সৃষ্টি হয়নি। ভালো হোক মন্দ হোক মুসলমানদের কোনো না কোনো নেতৃত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো , সত্যকে সাহায্য করার মতো এক দল লোক সব সময়ই সমাজে পাওয়া যেতো এবং অন্ততঃপক্ষে খারাপ পরিস্থিতি থেকে নিজের দ্বীন ঈমানকে হেফাযত করার জন্য হিজরত করে যাওয়ার জন্য কোনো না কোনো স্থানে যাওয়া যেতো। বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্ব ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, আর এই পরিস্থিতির মিল একমাত্র সাহাবায়ে কেরামদের পরিস্থিতির সাথেই পাওয়া যায়। আর এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই কঠিন পরিস্থিতিতে যারা কাজ করবে তাদেরকে নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অনেক বেশী পরিমান

আজর বা বিনিময় দান করবেন এবং তাদের মর্যাদা অনেক উচু স্তরে তুলে দিবেন। আমরা একথা বলছি না এদের বিনিময় সাহাবায়ে কেরামদের সমান হবে; বরং বলছি যে এদের বিনিময় অনেক উচু দরজার হবে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের আকীদা হলো- মর্যাদার দিক থেকে এই উম্মতের মধ্যে সব চেয়ে প্রথম হলেন সাহাবায়ে কেরামগন, তারপর তাবেয়ীগন, তারপর তাবে তাবেয়ীগন; কিন্ত আমরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই হাদিসকেও মনে রাখতে চাই যে হাদীসে তিনি বলছেন-

**فانّ من وراءكم اياماً الصبر فيهنّ مثل القَبْضِ على الجَمر، للعامل فيهنّ مثْلُ اجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم، قيل يا رسول الله اجر خمسين رجلاً منهم اَو منّا؟ قال بل اجر خمسين رجلاً منكم**

**তোমাদের পর এমন একটি যুগ আসবে যখন ধৈর্য ধরে দ্বীনের উপর কেবল টিকে থাকাটাই হাতে আগুনের অঙ্গার নিয়ে থাকার মতো কঠিন হবে; সে সময়ে যারা (আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য) কাজ করবে তাদেরকে পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ বিনিময় দান করা হবে; বলা হল ইয়া রসুলাল্লাহ, তাদের সমসাময়িক পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ বিনিময় নাকি আমাদের পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তোমাদের পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ।[4]**

অতএব তাদের সালাত হবে পঞ্চাশ জন সাহাবির সালাতের সমান, তাদের সিয়াম হবে পঞ্চাশ জন সাহাবীর সিয়ামের সমান; সকল আমলের বিনিময় দেয়া হবে পঞ্চাশ জন সাহাবীর সম পরিমান। কেন এতো বেশী বিনিময় দেয়া হবে? এর কারণই হলো এই জটিল কঠীন পরিস্থিতি। এই কঠিন পরিস্থিতিতে সঠিক ঈমান ও সঠিক আমলের উপর থাকার কারণেই তাদের বিনিময় এতো বেশী দেয়া হবে।

আমরা দেখতে পাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের শেষ যামানায় এমন কিছু সৌভাগ্যবান মানুষে কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন যারা হবে তার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত। যেমন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

**يخرج من عدن ابين اثنا عشر الفاً ينصرون الله و رسوله هم خير من بينى و بينهم**

**(দক্ষিণ ইয়েমেনের) আদনে আবইয়ান অঞ্চল থেকে বারো হাজারের একটা বাহিনীর আবির্ভাব হবে, তারা আল্লাহ্‌ ও তার রসুলকে সাহায্য করবে এবং আমার ও তাদের সময়ের মধ্যে তারাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।[5]**

লক্ষ করুন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন! তিনি বলছেন যে তারা আল্লাহর রসূল ও তাদের সময়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; সুতরাং আমরা ধরতে পারি যে তারা আল্লাহর রসূলের পর থেকে যতো যুগ যতো শতাব্দি পার হবে তার মধ্যে তারাই হবে শ্রেষ্ঠ। তাদের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? কারণ হলো তাদের সময়টা

---

[4] *ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী রহঃ বলেন- এই হাদিসটি হাসান গরীব সহীহ। ইমাম ইবনে কাসীর সূরা আল মায়িদার ১০৫ নং আয়াতের তাফসীরে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহতেও হাদীসটি সংকলিত হয়েছে, ইমাম বায়হাকী তার সুনানুল কুবরাতে, ইমাম তাবরানী তার মু' জামুল কাবীরে ও ইমাম হাকেম তার মুস্তাদরাকেও হাদিসটি সন্নিবেশিত করেছেন।*

[5] *হাদিসটির সনদ উত্তম, আব্দুর রাযযাক, মুনযির বিন নুমান আল আফতাস, ওয়াহহাবের সুত্রে ইবন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ সনদে বর্নিত। ইমাম আহমদ ও আবু ইয়া' লা রহঃ নিজ নিজ মুসনাদে হাদিসটি সন্নিবেশিত করছেন, ইমাম তাবরানী তার মুজামুল কাবীরে এবং ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীরেও হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।*

সাহাবায়ে কেরামদের সময়ের মতোই জটিল ও কঠিন। তাদেরকেও সেই একই ধরণের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে যা সাহাবায়ে কেরামদেরকে করতে হয়েছে।

সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এই স্বর্ণালী সময় হাতে পেয়েও কেন এতো অকারণ অভিযোগ?

জাতিয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক সময় অর্থনীতিতে এমন (বুম) স্ফিতি তৈরী হয় যে যারা তাদের ব্যবসা বানিজ্য একটু বুদ্ধি করে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে, যারা একটু রিস্ক নেয়ার সাহস দেখাতে পারে তারা হঠাত করে আংগুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার মতো বিরাট বিত্তশালী ধনী হয়ে যায়। আবার যখন অর্থনীতিতে স্থবিরতা নেমে আসে, বাজারে মন্দা সৃষ্টি হয় তখন অনেকে আফসোস করতে থাকে যে আহ ! ঐ সময় যদি আমি একটু বুঝতে পারতাম, যদি একটু রিস্ক নিতাম, যদি সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পারতাম তাহলে আমিও তাদের মতো মিলিয়নার বিলিয়নার হয়ে যেতাম!

হাসানাত ও আজর অর্জনের বাজারেও এখন (বুম) স্ফিতি চলছে, বেচা কেনাও চলছে ধুমছে, আমাদের অনেক ভাইয়েরা তাদের পন্য আল্লাহর কাছে বিক্রি করে কল্পনাতিত ব্যবসাও করে চলছেন, আমাদের শুধু বিষয়টা ভালো করে অন্তর দিয়ে বোঝা দরকার, আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার, বেচা কেনার জন্য বাজারে যাওয়া দরকার, কিছু করা দরকার।

আবার যখন সময় সহজ হয়ে যাবে একই পন্য বিক্রি করেও এতো পরিমান আজর পাওয়া যাবে না। কারণ হাসানাতের বাজারে আজরের পরিমান বৃদ্ধির সম্পর্ক পরিস্থিতির সাথে; পরিস্থিতি যতো জটিল কঠিন হবে আজর ততো বেশী হবে। অতএব কেন এই সময় ও পরিস্থিতির ব্যাপারে অকারণ অভিযোগ! এটা তো আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের সব চেয়ে উত্তম সময়।

আমরা যেখানে এমন একটা সময়ের কথা বলছি যখন বিজয় একান্ত নিকটবর্তী (আল্লাহু আ'লাম) আমরা যেখানে (ফিরক্বাতুন নাজিয়া বা ত্ব-ইফাতুম মানছূরা সম্পর্কে) আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করে যাওয়া ভবিষ্যত বাণী বাস্তবে প্রত্যক্ষ করছি যারা ইমাম মাহদীকে বিজয়ী করবেন, যারা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিজয়ী করবেন; আমরা যদি মনে করি যে আমরা বহুল প্রতিক্ষিত, বহুল আকাংখিত সেই সিদ্ধান্তকর সময় অতিক্রম করছি, আর তারপরও যদি আমরা বাস্তব ময়দানে কাজে অংশগ্রহণ না করি, যদি আমরা নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করি তাহলে আমাদের পরিণতি হবে অত্যান্ত ভয়াবহ; অতএব জান্নাত ক্রয়ের এই স্বর্ণালী মুহূর্তে কিছুতেই আমাদের হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয় যখন অন্যরা জান্নাতের অনেক উচু মাকামগুলিতে নিজেদের জন্য বুকিং দিয়ে ফেলছে। আমাদের উচিত নয় শুধু অভিযোগ করা আর নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা।

সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

**ان الله زوى لى الارض فرءيت مشارقها و مغاربها وانّ ملك امّتى سيبلغ ما زوّى لى منها**

**আল্লাহ তায়ালা গোটা দুনিয়াকে আমার সামনে একত্রিত করে তুলে ধরেছেন এবং আমি এর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত**

**অবোলোকন করেছি এবং নিশ্চিতভাবে (তোমরা শুনে রাখো) আমার উম্মতের কর্তৃত্ব ততো দূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করবে যতো দূর পর্যন্ত আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছে।** [6]

অতএব আমাদের বর্তমান অবস্থা যতোই দুর্বল হোকনা কেন সেই দিন ইনশা আল্লাহ আর বেশী দূরে নয় যেদিন এই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিটি নগর মহানগর, দেশ মহাদেশের উপর এর প্রভাব বিস্তার করবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকা প্রতিটি নগর মহা নগরীতে সমহিমায় পতপত করে উড়বে। পৃথিবীর এমন প্রতি ইঞ্চি জায়গার উপর আল্লাহর এই দ্বীন বিজয় লাভ করবে যেখানে দিন রাতের আলো আধার পৌঁছায়।

এমন কোনো স্থান কি পৃথিবিতে আছে যেখানে রাতের আধার দিনের আলো পৌঁ ছায় না?

অতএব হে কাফিররা, হে কাফিরদের দোসর মুনাফিকরা! তোমরা যদি এই দ্বীনের আলো থেকে নিজেদেরকে লুকাতে চাও তাহলে তোমাদেরকে এই পৃথিবীর বুক ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। সেই দিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন এই দুনিয়াতে তোমাদের জন্য এক ইঞ্চি জায়গাও থাকবে না যেখানে গিয়ে তোমরা আত্মগোপন করবে।

[6] *সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৮৯, মুসনাদে আহমদ হাদিস নং ২২২৯৪, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযিও তাদের সুনানে হাদিসটি সংকলন করেছেন।*

## বিজয় আসন্নঃ

আমরা দাবী করছি যে মুসলিম উম্মাহর বিজয় অতি সন্নিকটে। আসু ন এখন আমরা আমাদের দাবী প্রমান করি; আমরা আমাদের এই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইতিপূর্বে উল্লেখিত মূলনীতিটাকে ব্যবহার করবো , আর সেই মূলনীতিটা হলো-

**اذا اراد الله شيئاً هيّئ له اسبابه**

**"আল্লাহ যদি কোনো অবস্থার পরিবর্তন চান তাহলে তিনি তার জন্য উপায় উপকরণ তৈরী করেন"।**

প্রথমে আসুন আমরা এই মূলনীতিটা সঠিক কি না তা ভালো করে বুঝে নিই। এই মূলনীতিটা যে একটা অকাট্য সত্য মুলনীতি তো বোঝার জন্য আমরা কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে তাকাবো ; আর এর মাধ্যমে ইনশা আল্লাহ আমাদের এই মুলনীতিটার বাস্তবতা নিশ্চিতভাবে প্রমানিত হবে।

### *প্রথম উদাহরণঃ*

সহীহ আল বুখারীতে আয়শা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর বর্ণনায় একটি হাদিস রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবিরাম তেরটি বছর ধরে দাওয়াহ দিচ্ছিলেন, এরপর যখন তিনি চূড়ান্ত একটা অবস্থায় পৌছুলেন তখন তিনি বিকল্প কোনো পথ খুজছিলেন , বিকল্প পথ খুজতে গিয়ে তিনি গেলেন তায়েফে, কিন্তু তারাও তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। তিনি প্রত্যেক বছর হজ্বের সময় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা বিভিন্ন গোত্রের সামনে নিজেকে (নিজের নবুয়তকে) উপস্থাপন করতেন এবং প্রত্যেক গোত্রের কাছে একটা বিশেষ একটা সাহায্য চাইতন। তিনি বলতেন, **'তোমরা আমাকে নুসরাত দাও যাতে আমি আমার রবের বাণী সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারি'।**

কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করতো। আল্লাহ তায়ালা চাইলেন এই মহান কাজের বিনিময় অন্য কাউকে দিয়ে তাদেরকে ধন্য করতে, আর তারা হলো মদীনার আওস ও খাজরাজ গোত্র। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে প্রস্তুত করছিলেন?

আওস ও খাজরাজ দীর্ঘ দিন থেকে একে অন্যের বিরুদ্ধে এক চরম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো; যুদ্ধই ছিলো তাদের জীবন, জীবনই ছিলো তাদের যুদ্ধ; যুদ্ধ করতে করতে তারা ক্লান্ত শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো। হ্যা , এটাই স্বাভাবিক, যে যতো বড় যোদ্ধা ও বীর পুরুষই হোক না কেন যদি মানুষের সহ্য সীমার বাইরে চলে যায় , যদি প্রশ্ন জাগে যে কখন এই যুদ্ধ থামবে? কেনই বা আমরা এই অকারণ এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত? তখন আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায় না। এভাবে এই যুদ্ধ এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছলো যা তাদের পক্ষে আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। এই অবস্থায় তাদের সামনে এলো ইয়াওমুল বুয়াস। আয়শা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এই বুয়াস যুদ্ধের সময়টা ছিলো এমন একটা সময় যা আল্লাহ তায়ালা তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটা

বিশেষ উপহার হিসেবে দান করেছেন। অথচ বুয়াসের সাথে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক ছিলো না, এটা ছিল একান্তই মদীনার লোকদের আভ্যন্তরীণ ব্যপার, আর সে সময়ে মদীনার সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। এই বুয়াস যুদ্ধে আওস ও খাজরা জ একে অপরের উপর নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং শুধু সাধারণ মানুষই নয় বরং তাদের উভয় পক্ষের নেতৃ স্থানীয় লোকদের প্রায় সবাই নিহত হয়; যার কারণে আওস ও খাজরাজ উভয় গোত্রই নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় সারির যেসব নেতারা বেচে ছিলেন তারাও কোনো না কোনো ভাবে আহত হয়ে বেচেছিলো।

আপনি যদি একটু মনোযোগ সহকারে কোরআনে উল্লেখিত অতিতের নবীদের ইতিহাস পড়ে থাকেন তাহলে দেখতে পাবেন যে যুগে যুগে আল্লাহ র নবীদের বিরোধিতায় যারা অগ্রণী ভুমিকা পালন করেছে তারা সকলেই প্রায় নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর লোক। তারা হলো সেই শ্রেণীর লোক যাদেরকে কুরআনুল কারীমে **‘মালা’** বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আর ‘মালা’ বলা হয় নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে। হতে পারে সে নেতৃত্ব রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক, কিংবা সামাজিক। এই নেতৃস্থানীয় লোকেরাই যুগে যুগে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে কাঁটা হয়ে দাড়িয়েছে, আল্লাহর নবীদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছে।

এর কারণ হলো তারা জানে যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে এদের ক্বায়েমী স্বার্থই সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তারা জানে, তারা যে শোষণের সমাজ কায়েম করে রেখেছে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সেখানে কায়েম করবে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ। তারা জানে যে নবীদের আগমনই হলো নেতৃত্ব কর্তৃত্ব তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার হাতে অর্পন করার জন্য। যার কারনে তারা সমাজে তাদের যে একটা বিশেষ মর্যাদা বা স্ট্যাটাস কায়েম করে রেখেছ তা আর থাকবে না, ইসলামের সমাজে সকল মানুষ এক আল্লাহর বান্দা বা গোলাম হিসেবে সমান ম র্যাদা ভোগ করবে এবং সমাজে খিলাফাহ ব্যবস্থা কায়েম করা হবে শুধু আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য , কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠির মনগড়া বিধানের কোনো স্থান এই সমাজে থাকবে না; বরং মানবরচিত আইনের নোংড়া জঞ্জালকে সেই সমাজ থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করা হবে।

তাই তো আমরা দেখতে পাই আবু বকর বা ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু- তাদের কাউকেই তাদের ব্যক্তি বা গোষ্ঠির স্বার্থের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়নি বরং তাদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো কেবল আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য।

একটি পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজে কেউ কখনো নেতৃত্ব কর্তৃত্বের লোভী হয় না ; কারণ তারা সবাই জানে যে নেতৃত্ব কর্তৃত্ব এমন এক বোঝা যা বহন না করাই ভালো , যার দায়িত্ব যতো বেশী থাকবে তাকে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে আল্লাহর বিচারের দরবারে ততো বেশী প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হবে। যার কারণে এক জন সঠিক ঈমানদার কখনো আগ বাড়িয়ে দায়িত্বের বোঝা নিজের কাধে তুলতে চায় না। তাই তো আমরা দেখতে পাই খুলাফায়ে রাশেদার প্রত্যেককে খিলাফাতের দায়িত্ব জোর করে দেয়া হয়েছে, তারা কেউই এই দায়িত্ব নেয়ার জন্য লালায়িত ছিলেন না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু চাচ্ছিলেন ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বায়াত দিতে কিন্তু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জোর করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বায়াত নিতে বাধ্য করেছেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকালের সময় জোর করে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর উপর খিলাফাতের দায়িত্ব হস্তান্তর করে গিয়েছেন। ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন মুমুর্ষ অবস্থায় তখন লোকেরা তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু

কে খিলাফাতের দায়িত্ব দিতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন 'আমি চাই না কিয়ামতের দিন আমার পরিবার থেকে দুই জন এতো বড়ো বোঝা কাধে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হোক'।

তাহলে আমরা দেখতে পাই যে যুগে যুগে ফিরাউন, ক্বারুন, আবু জাহল ও আবু লাহাবদের মতো নেতৃ স্থানীয় লোকেরাই ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছে। এরাই হলো সেই সমস্ত লোক যারা নেতৃত্বের অপব্যবহার করে অর্থবিত্ত, পদমর্যাদা, খ্যাতি ইত্যাদির অধিকারী হয়ে দম্ভ দেখিয়ে বেড়ায়। এরাই তাদের সামাজিক অবস্থান ধরে রাখার জন্য ইসলামের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান হারানোর ভয় তাদেরকে সারাক্ষণ তাড়িয়ে বেড়ায়।

তবে হ্যা, লোকেরা যদিও তাদেরকে অনেক ক্ষমতাশালি ও মুক্ত স্বা ধীন মনে করে কিন্তু বাস্তব অর্থে তারা কিন্তু মোটেও মুক্ত স্বাধীন নয়; তারা মানুষের গোলাম, তারা লোভের গোলাম, তারা খ্যতির গোলাম, তারা বিত্তের গোলাম; সর্বপরি তারা কুপ্রবৃত্তির গোলাম। কারণ মানবরচিত মুল্যবোধ ও বিধিব্যব স্থার মধ্যে বসবাস করে কোনো মানুষ কখনো সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হতে পারে না, সে অসংখ্য প্রভুর গোলামীর জিঞ্জিরে বন্দি হয়ে থাকে।

একারণে আমরা দেখতে পাই যখন রাবী বিন আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমনের জন্য গিয়েছিলেন তখন পারস্য সম্রাট তাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'তোমরা কেন আমাদের দেশ আক্রমন করতে এসেছো? তোমরা যদি অর্থ বিত্তের জন্য আমাদের উপর আক্রমন করে থাকো তাহলে বলো, আমরা তোমাদের প্রত্যেককে পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ দিবো, তারপরও তোমরা চলে যাও। রাবী বিন আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমরা এখানে অর্থবিত্তের জন্য আসিনি, আমরা এসেছি মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামীর বন্ধনে আবদ্ধ করতে, ধর্মের নামে প্রচলিত অন্যায় অবিচারের হাত থেকে মুক্ত করে ইসলামের ন্যায় ইনসাফ কায়েম করতে, দুনিয়ার সংকির্ণ মানসিকতা থেকে মুক্ত করে মানুষকে আখিরাতের দিগন্ত বিস্তৃত বিশালতার জগতে পদার্পন করাতে।

খেয়াল করুন, রাবী বিন আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে ধর্মতত্ত্বের ছাত্র বলেননি বরং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মই হলো যু লুম। এটা জানার জন্য তিনি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়ে জ্ঞান অর্জন করেননি বরং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ ওয়াহীর মাধ্যমেই তিনি জেনে নিয়েছেন যে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সকল ধর্মই হলো যুলুম অবিচারের ধর্ম এবং একমাত্র ইসলামই মানবজাতিকে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ উপহার দিতে পারে।

বুয়াস যুদ্ধ মুলত মদীনার জনগনকে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করেছে, নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামের ভবিষ্যত ভুখণ্ড হিসেবে বুয়াস যুদ্ধ মদীনাকে প্র স্তুত করেছে। তাইতো আমরা দেখতে পাই ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আনসাররা হজ্ব করতে মক্কায় এসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের সংবাদ শুনে তারা বলেছিল, 'চলো আমরা এই ব্যক্তিকে আমাদের দেশে নিয়ে যাই, হয়তো আল্লাহ তায়ালা তার মাধ্যমে আমাদেরকে আবার ঐক্যবদ্ধ করে দিবেন'।

তারা তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের হারিয়ে সত্যিই বড় অসহায় হয়ে পড়েছিলো, তারা তাদের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব বোধ করছিলো। আসলেই মানব জাতির জন্য নেতৃত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় , কল্যাণকর কাজের

দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য হোক বা মন্দ কাজের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য হোক নেতৃত্বে র কোনো বিকল্প নেই, নেতৃত্ব থাকতেই হবে। শয়তানের দলেরও নেতা থাকে আর আল্লাহর দলেরও নেতা থাকে , এটা মানুষের স্বভাবধর্ম, পথ প্রদর্শনের জন্য সে সব সময়ই নেতৃত্বের মুখাপেক্ষি।

মদীনার লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালা যতো ভাবে প্রস্তুত করেছেন তার আর একটি দিক ছিলো এই যে মদীনার লোকদের কাছেই ইহুদীরা বসবাস করতো, আর তাদের কাছ থেকে তারা একজন নবীর আগমনের কথা দির্ঘ দিন থেকে শুনে আসছিলো, যার কারণে নবী আগমনের ব্যাপারটা তাদের কাছে অনেকটা স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়। আরব উপদ্বীপের অন্যদের কাছে নবী আগমনের বিষয়টা এতোটা স্বাভাবিক বিষয় ছিলো না। মদীনার আনসারদেরকে ইহুদীরা বিভিন্ন সময় এই বলে হুমকি দিতো যে শিঘ্রই আমাদের মাঝে একজন নবী আসবেন এবং এরপর আমরা তোদেরকে এমনভাবে হত্যা করবো যেভাবে আদ জাতিকে হত্যা করা হয়েছিলো। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, নবী ঠিকই এসেছেন কিন্তু স্বভাবের গোয়ার্তুমী আর মনের বক্রতার কারণে সেই ইহুদীরা হেদায়াত পেলো না যারা সেই নবী আগমনের খবর অন্যদেরকে শুনাতো। আল্লাহ আযযা ওয় জাল্লা চাইলেন মদীনার আনসাররা ইসলাম গ্রহণ করুক এবং তার নবীর সাহায্যকারী হোক। আনসাররা বুয়াস যুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করছিলেন ঠিকই কিন্তু তারা কি ঘূর্ণাক্ষরেও জানতেন যে এই যুদ্ধ কিভাবে তাদেরকে ইসলামের নিকটবর্তী করছে। এটা ছিলো সম্পূর্ন একটি জাহেলী যুদ্ধ ; কিন্তু সবার অজান্তে এই যুদ্ধ তাদের আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার নিকটতম প্রিয় বান্দা হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন রকম অবস্থা তৈরী করেন যার অন্তর্নিহিত রহস্য হয়তো মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না।

### *দ্বিতীয় উদাহরণঃ*

এটি দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সময়ের ঘটনা; তিনি পারস্য সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি এই মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন আবু ওবায়দা আস সাকাফী রহঃ কে। তিনি ছিলেন খুবই উৎসাহী ও বীর পুরষোচিত চরিত্রের অধিকারী। তবে ঘটনাক্রমে এই যুদ্ধে তিনি এমন কয়েকটি ঝুকি নিয়ে ফেলেন যা হয়তো না নিলেও চলতো , আর এই মাত্রারিক্ত ঝুকির কারণে জিস্‌র বা সেতু যুদ্ধে মুসলমানদের ভাগ্যে এক পর্যায়ে পরাজয়ের গ্লানী নেমে আসে। সেদিন মুসলিম বাহীনির প্রায় অর্ধেক সংখ্যক সৈন্য শহীদ হয়ে যায়।

পারস্য বাহিনী তখন ভাবছিলো যে বাকি মুসলিম বাহিনীকে নির্মুল করে দেয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ , আর যুদ্ধের ফলাফল নিশ্চিতভাবে তাদের অনুকুলেই যাবে। তারা ভাবছিলো , মুসলমানরা যেসব এলাকা ইতিপুর্বে দখল করে নিয়েছিলো এবার তাদেরকে সে সব এলাকা থেকেও তাদেরকে উৎখাত করে দিতে সক্ষম হবে। বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ আত তারীখুল ইসলামীর লেখক জনাব মাহমুদ শাকির বর্ণনার এ পর্যায়ে এসে লিখেছেন 'কিন্তু ঈমানদারদের সাথে রয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা'। ঈমানদাররা যদি বিজয়ের শর্তগুলো সঠিকভাবে পুরণ করতে সক্ষম হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে বিজয় দান করবেন, তা যেভাবেই হোক। তাতে তাদের সৈন্য সংখ্যা বিশাল হোক বা না হোক, তাদের কাছে পারমানবিক বোমা থাকুক বা না থাকুক। এ সকল উপায় উপকরণ এমন কোনো বিষয় নয় যা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রন করে। ঈমানদাররা যদি ঈমানের দাবী মোতাবেক তাদের দায়িত্ব কর্তব্য

সঠিকভাবে পালন করে তাহলে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিজয় দান করবেন; এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنْ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

**নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে (অকল্যাণ থেকে) রক্ষা করেন। আল্লাহ তায়ালা বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞদেরকে মোটেই ভালোবাসেন না।** *(সূরা আল হাজ্জ, আয়াত ৩৮)*

আল্লাহ তায়ালা একথা বলেননি যে তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন যাদের অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে, যারা সংখ্যায় অনেক, বরং তিনি তাদেরকে রক্ষা করার কথা বলেছেন যাদের ঈমান আছে; আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য এটাই হলো শর্ত যা আমাদেরকে পূরণ করতে হবে। তাই বাহ্যিক অব স্থা দেখে যদিও মনে হচ্ছিলো যে মুসলমানরা এ যুদ্ধে হারতে যাচ্ছে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিলেন যার পরিপ্রেক্ষিতে রাত পোহাতে না পোহাতেই বিজয়ের পাল্লা মুসলমানদের দিকে ঝুকে পড়লো। তাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে , মুসলমানরা যতোই কঠিন পরি স্থিতির মধ্যে পড়ুক না কেন তারা যদি আল্লাহর হুকুম পালনের ব্যাপারে আ ন্তরিক হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই সেই সমস্যা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করবেন।

আসুন এবার শুনি এই মুলিম বাহিনীর জন্য আল্লাহ তায়ালা কিভাবে পরি স্থিতি তৈরী করে দিয়েছিলেন।

যখন যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানরা প্রায় পরাজয়ের সম্মুখিন হয়ে পড়েছিলো ঠিক তখনই পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানিতে আল্লাহ তায়ালা ঘটিয়ে দেন এক বিপর্যয়কর ঘটনা। পারস্য সাম্রাজ্যের দুই প্রধান নেতা একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে; যার ফলে সেনাবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে অর্ধেক নেয় সেনাপতি রুস্তমের পক্ষ, আর অর্ধেক নেয় সম্রাটের পক্ষ।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত বাহিনীর দায়িত্বে থাকা সেনাপতিকে রাজধানীতে জরুরী তলব করা হয়। সেনাপতি রাজধানীতে ফিরে পাওয়ার কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। আর এই সময়টুকু মুসলমানদের জন্য হয়ে দাড়ায় একটি সু বর্ণ সুযোগ। খলীফাতুল মুসলিমিন ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পর্যাপ্ত সময় পেয়ে যান দ্রুত সৈন্য পাঠিয়ে মুসলিম বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া র জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণের।

আলোচ্য ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, ঠিক সেই মুহূর্তেই আল্লাহ তায়ালা পারস্য সাম্রা জ্যের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ লাগিয়ে দিলেন যখন তা দরকার। আল্লাহ তায়ালা চাচ্ছিলেন সেই এলাকায় ইসলামের পতাকা উড্ডিন হোক; আর এদিকে মুসলমানরাও তাদের দায়িত্ব পালনে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহাত রেখেছিলো , তাই যেখানে দেখা যাচ্ছিলো যে মুসলমানরা পরাজয়ের একেবারে দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছে সেখানে সেই অবস্থা পরিবর্তন করে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন।

*তৃতীয় উদাহরণঃ*

এই উদাহরণটি আমরা নেবো ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস থেকে। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে দিয়ে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়ার কারণে মুসলমান শা সকরা যখন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলো তখন পবিত্র ভুমি রক্ষার জন্য সালাহউদ্দীন আইউবী মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করেন। কাপুরুষ শাসকরা কাফেরদের ভয়ে চরমভাবে ভীত সন্ত্র স্ত হয়ে পড়ে। অথচ কাফেররা শামের বেশ কিছু গুরুত্বপুর্ণ এ লাকা ও জেরুজালেম সহ গোটা সমুদ্র উপকুলীয় অঞ্চলসমুহ দখল করে নিয়েছিলো।

সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর এই যুদ্ধের প্র স্তুতির খবর যখন ক্রুসেডাররা শুনলো তখন তারা বিষয়টাকে মোটেই হালকা ভাবে নিলো না। কারণ তারা জানতো এই যুদ্ধের নেতত্ব কে দিচ্ছে , তারা জানতো সালাহউদ্দীন কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়।

এদিকে মুসলমানদের আলিম ওলামা ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা আরম্ভ করলো সালাহউদ্দীনের বিরোধিতা। তারা সালাহউদ্দীনকে অতি উৎসাহী বলে তার কঠোর সমালোচনা আরম্ভ করে দিলো। রোম সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকে তারা পাগলামো বলে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীকে তিরস্কার করতে লাগলো। তারা বলতে লাগলো যে রোম এতো বড় এক বিশাল সাম্রাজ্য যাকে কুল কিনারা হীন সমুদ্র বলা যায়। তারা রোম সাম্রাজ্য ও ইউরোপকে এতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলো যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা তারা চি ন্তাই করতে পারছিলো না। তারা চিন্তা করছিলো যে গোটা ইউরোপ তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ; আর অন্য দিকে মুসলমানরা হলো শতদাবিভক্ত। অতএব এমন একটি বিভক্ত জাতি নিয়ে বিশাল সামরিক শক্তিধর ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাওয়া র অর্থ হলো মুসলমানদেরকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়া। কি ন্তু সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহঃ একমাত্র আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার উপর তাওয়াক্কুল করেছেন। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাদের থেকে মুসলমানদের ভুখন্ড পুনরুদ্ধার আরম্ভ করেন। এই অব স্থা দেখে পোপ গোটা ইউরোপকে আর একটি নতুন ক্রুসেডের জন্য সংগঠিত করতে আরম্ভ করে, যেটা ছিলো ৪র্থ ক্রুসেড এবং এটা ছিলো সর্ব বৃহ ৎ ক্রুসেড, কারণ এটা ছিলো সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে।

মুসলমানদের সামরিক নেতৃত্বে এবার সালাহউদ্দীনকে দেখে এই যুদ্ধকে তারা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিলো এবং তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। তাদের যুদ্ধ প্র স্তুতি এবং সেনা নায়ক নিয়োগ দেখেই বোঝা যায় যে তারা এই যুদ্ধকে কেমন গুরুত্ব দিয়েছিলো; আমরা দেখতে পাই যে এই যুদ্ধে তারা কোনো জেনারেলদের উপর দায়িত্ব না দিয়ে স্বয়ং তাদের শাসক রাজা বাদশাহরা নিজেরা যুদ্ধের ময়দানে এসে সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছে। ইংল্যান্ড , ফ্রান্স ও জার্মানির রাজা নিজেরা সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বেরিয়ে পড়েছে এবং তারা নিজেরা নিজ নিজ সেনাবাহীনির নেতৃত্ব দিয়েছে। ইংল্যান্ড , জার্মানি ও ফ্রান্স যখন একই সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে তখন তাদের সেনাবাহিনীর আকার এতো বিশাল হয়ে দাড়ায় যা তৎকালিন সময়ের প্রেক্ষাপটে অস্বাভাবিক ধরণের এক বিশাল সেনাবাহিনী হিসেবে আবির্ভূত হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় শুধু জার্মান কিং ফ্রেডরিক বার্বারোজ একাই তিন লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করে। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে তিন লক্ষ সৈন্যের কোনো বাহিনীর কথা শুনলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এমনিতেই যে কোনো মানুষ মুর্ছা যাওয়ার কথা। সম্মিলিত ইউরোপিয়ান বাহিনী এতো বিশাল আকার ধারণ করে যে তাদের নৌবাহিনীর

জাহাজ এবং ইউরোপিয়ান বানিজ্যিক জাহাজগুলো দিয়েও তাদেরকে বহন করে আনা অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছিলো। তাই ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের সৈন্যরা নৌজাহাজে যাত্রা করলেও জার্মান বাহিনীকে স্থল পথে যাত্রা করতে হয়।

এবার আসুন আমরা একটু জেনে নিই তৎকালীন মুসলমান সমাজের তথাকথিত আলেম ওলামাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিলো এবং তারা কী ভুমিকা পালন করেছিলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে আসীর রহঃ বলেন, ইউরোপিয়ানরা নৌপথ ও স্থল পথে এগিয়ে আসছিলো মুসলমানদের উপর আক্রমন করতে। চারিদিকে খবর চড়িয়ে পড়লো যে শুধু জার্মান কিং একাই তিন লক্ষ দুর্ধর্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমন করতে উত্তর সিমান্ত দিয়ে এগিয়ে আসছে।

আলেম ওলামাদের অনেকেই প্রথমে নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য প্র স্তুত করছিলেন যে তারা শাম অঞ্চলে গিয়ে শক্রুদের মোকাবেলায় আল্লাহর পথে জিহাদ করবেন, কিন্তু পরক্ষণে তারা যখন নিশ্চিতভাবে ইউরোপীয় বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন তাদের অনেকেই পিঠ টান দিয়ে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে ফিরে আসলেন।

প্রশ্ন হলো কেন তারা ফিরে গেলেন?

শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা বেশী হলে কি যুদ্ধের মাসআলা পরিবর্তন হয়ে যায় ? তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন অথচ কেবলমাত্র শক্রুসৈন্যের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলেন! অথচ তারা ছিলেন ঐ সময়কার আলেম ওলামা!

অতএব আমাদেরকে এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে যে কেবল আলেম হলেই যে কেউ সর্বাবস্থায় হক্বের উপর টিকে থাকতে পারবেন এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। আলেমরা নবী নন, তারাও সাধারণ মানুষদেরই মধ্য থেকে আসা, তারা কখনো হক্বের উপর থাকতে পারেন, আবার কখনো হক্বের পথ থেকে বিচ্যূতও হয়ে যেতে পারেন। অতএব আমরা যদি তাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে থাকি তাহলে সব সময় যে তারা আমাদেরকে হক্বের পথের দিকেই নিয়ে যাবেন তা নিশ্চিত নয়। তবে একেবারে সকল আলেমরা যে হক্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবেন বিষয়টি তাও নয়, তাই ইবনে আসীর রহঃ বলেছেন তাদের বিরাট একটা অংশ ময়দান ছেড়ে চলে এসেছিলো।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়াসাল্লাম বলেন-

**لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ،**

**এই উম্মাহর মধ্যে সব সময়ই এমন একটি তাইফা বা দল থাকবে যারা হক্বের উপর টিকে থাকবে।** *(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ)*

ঘটনা হলো সাধারণ জনগনের অনেকেই নিজেদের বিবেক দিয়ে তাদের দায়িত্বেবোধ উপলব্ধি করতে পারেন, তারপর তারা তাদের দায়িত্ব এড়ানোর জন্য তাদের বিবেক বোধকে হক্ব পথ থেকে বিচ্যুত আলেমদের সাথে লটকে ফেলেন, তারা বলতে থাকেন যে আমাদের আলেম ওলামারা তো (জিহাদের) এই কথা বলেন না, অমুক

আলেম এই ফতোয়া দিয়েছেন তো অমুক আলেম ঐ ফতোয়া দিয়েছেন , তারা তো আমাদেরকে জিহাদে অংশগ্রহন করতে বলছেন না। আর একারণে হক্বপন্থি আলেমরা যখন তাদেরকে জিহাদে অংশগ্রহন করতে বলেন তখন তারা এই তথাকথিত আলেমদের দোহাই দিয়ে সত্য পথ অবলম্বন থেকে বিরত থাকে।

আর কুফর নিয়ন্ত্রিত সমাজে হক্বপন্থি আলেমদের অতোটা নাম ডাক না থাকার কারণে তাদের কথা জনগনকে সঠিকভাবে জানতেও দেয়া হয় না। তাদেরকে হয় ত্বাগুতরা হত্যা করে ফেলে, অথবা তাদেরকে কারারুদ্ধ করে রাখে, অথবা তাদেরকে থাকতে হয় গোপনে লুকিয়ে । তারা তো এই কুফুরী সমাজে বিখ্যাত হতে পারেন না, কারণ তাদের খুৎবা রেডিও টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয় না। আর বর্তমান যুগের এক মারাত্নক ফিৎনা হলো যে আজকাল কে কতো বড় আলেম তা মাপা হয় নাম জশ ও খ্যাতি দিয়ে, যে যতো বেশী বিখ্যাত সে ততো বড় আলেম। অথচ এটা মোটেও গ্রহনযোগ্য মানদন্ড নয়।

একটা সময় ছিলো যখন সত্যিকারের ইলম এবং উস্তাদদের প্রত্যয়নই ছিলো আলিম হওয়ার মানদন্ড, কিন্তু কালের বিবর্তনে এ পদ্ধতি আজ প্রায় উঠেই গেছে, এখন সরকারী নিয়োগের কারণে রাতারাতি অনেক ব্যক্তি বিখ্যাত আলেম হয়ে যায়, যে যতো বড় সরকারী পোস্টে আছে, যাকে যতো বেশী স্যাটেলাইট টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায় সে ততো বড় আলেমে পরিণত হয়। অথচ এমন পদ্ধতিতে সাধারনতঃ আপষকামী ও দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীন বিক্রিকারী ব্যক্তি ব্যতিত কারো পক্ষেই বিখ্যাত আলেমের খেতাব পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদেরকে এই ধোকার পিছনে পড়লে চলবে না, আমাদেরকে হক্বের কথা বলতে হবে এবং হক্বের কথা শুনতে হবে তা যেখানেই থাকুক না কেন।

আসুন মুল ঘটনায় ফিরে যাই। ইবনে আসীর র হঃ বলেন, শক্রুদের সংখ্যা শুনে আলেমদের অনেকেই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু যেহেতু তারা আলেম তাই তারা তাদের প লায়নের বৈধতার জন্য অজুহাত ও দলীল খুজতে লাগলেন, আর তাদের জন্য তো দলীলের কোনো অভাবও হবে না, কারণ তারা জানেন আল্লাহর আয়াত ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের অর্থ কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় এবং কিভাবে তার নিজের মন গড়া কাজকে শরীয়তের মানদন্ডে বৈধতা দিতে হয়। তারা যেহেতু আলেম তাই তারা কখনোই তাদের অন্তরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া শক্রুর ভয়ের কথা প্রকাশ করবেন না, নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে তারা কখনোই বলবেন না যে আমরা কাপুরুষ তাই আমাদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহন করা সম্ভব নয় ; বরং কোরআন হাদীসের অপব্যখ্যা করে নিজেদের দুর্বলতাকে গোপন করার জন্য হয়তো তারা বলবে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াটা উম্মাহর বর্তমান অবস্থার সাথে হিকমার খিলাফ।

এভাবেই তৎকালীন আলেম শ্রেনীর অধিকাংশ বলা আরম্ভ করল যে সালহউদ্দীন এতো বড় বাহিনীর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পাগলামো আরম্ভ করেছে, আমরা তাকে বারবার নিষেধ করার পরও সে আমাদের কথা শুনছে না, তাছাড়া সালাহউদ্দীনে নেতৃত্ব মেনে নেয়া যায় না; কারণ সে তো কোনো আলেম নয়, সে তো ভালো করে আরবীও বলতে পারে না; কে তাকে অধিকার দিয়েছে এতা বড় সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং উম্মাহকে এতো বড় বিপদের মধ্যে ফেলার; তার উচিত ছিলো আমাদের আলেমদের কাছে এসে আগে ফতোয়া নেয়ার, কিন্তু সে যেহেতু তা করলো না অতএব সে একা গিয়ে যুদ্ধ করে মরুক ।

এসব কথা বলে আলেমদের একটা ব্যপক অংশ চলে গেলো; কিন্তু কি হলো তারপর! তা আমরা সবাই জানি। মুলত এটা ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা , আলেমদের জন্যও পরীক্ষা, সালাহউদ্দীনের জন্যও পরীক্ষা এবং গোটা উম্মাহর জন্য পরীক্ষা।

এক দিকে ইউরোপের বিশাল বাহিনী মুসলমানদেরকে সমুলে উৎখাত করার জন্য এগিয়ে আসছিলো; আর অন্য দিকে মুসলমানদের মধ্যে চলছিলো ফতোয়াবাজি আর অনৈক্যে র প্রচন্ড ঝড়। সবশেষে মুসলমানদের একদল বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে গেলো আর স্বল্প সংখ্যক হলেও একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য অটল অবিচল সামনে এগিয়ে গেলো। ঠিক যেমন আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাইলদেরকে সমুদ্রের সামনে এনে পরীক্ষা করেছিলেন। এটা ছিলো মুমিনদের জন্য একটা পরীক্ষা , আল্লাহ তায়ালা সব সময়ই এভাবে মুমিনদেরকে পরীক্ষা করে নেন, তিনি কোন মুমিনদের ধংস চাননা, তিনি শুধু পরিক্ষার মাধ্যমে সত্যিকার ইমানদারকে বাছাই করে মুনাফিকদের থেকে আলাদা করে নেন। আমরা দেখতে পাই যখন মুসা আ লাইহিস সালাম নীল নদের সামনে এসে পৌছলেন তখন কি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো! সামনে নীল নদ আর পেছনে ফেরাউনের বাহিনী দেখে বনী ইসরাইলরা এসে মুসা আলাইহিস সালামকে বলতে লাগলো যে আপনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রক্ষা করবেন অথচ মৃত্যু ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই , সামনে নীল নদ আর পেছনে ফেরাউনের বাহিনী, সুতরাং এখান থেকে আমাদের বাচার আর কোনো উপায় নেই। এই কঠিন অব স্থায় মূসা আলাইহিস সালাম কী জবাব দিয়েছিলেন আল্লাহ তায়ালা তার পবিত্র কালামের মাধ্যমে আমাদেরকে সেই অসাধারণ ঐতিহাসিক জবাবটি জানিয়ে দিয়েছেন। মূসা আ লাইহিস সালাম বলেছিলেন-

**كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِي**

**কিছুতেই নয়; নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার প্রতিপালক রয়েছেন, তিনি শিঘ্রই আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।** *(সূরা আশ শুয়া'রা, আয়াত ৬২)*

সত্যিকার অটল অবিচল ঈমানের কি অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ! সামনে নীল নদ পেছনে ফেরাউনের বাহিনী স্বচক্ষে দেখা সত্তেও যেন তিনি বলছেন আমি আমার নিজ চোখকেও অবিশ্বাস করি, আমি কেবল বিশ্বাস করি আমার ঈমানকে, আল্লাহ তায়ালা যেহেতু ওয়াদা করেছেন তিনি নিশ্চয়ই তার ওয়াদা পুরণ করবেন , বাহ্যিক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন তাতে কিছুই আসে যায় না। এভাবে তিনি যখন ঈমানের পরীক্ষায় পাস করে গেলেন তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে নির্দেশ দিলেন তার লাঠি দিয়ে নীল নদের পানির উপর আঘাত করতে। এরপর কি হয়েছিলো আমাদের সবারই তা কম বেশী জানা আছে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলকে যাচাই করে নিলেন কে তাদের মধ্যে ঈমানের প্রশ্নে অটল অবিচল আর কার ঈমান শুধু মৌখিক দাবী।

ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটেছে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর সময়। এটা ছিলো একটা পরীক্ষা। পরীক্ষার মাধ্যমে ঈমানদার আর ঈমানের দাবীদারদেরকে আল্লাহ তায়ালা যখন আলাদা করে নিলেন তখন আল্লাহ তায়ালা নিজ কুদরতেই মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। ফ্রেডরিক বার্বারোজ যে তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে রওয়ানা দিয়েছিলো তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে শায়েস্তা করলেন আসুন আমরা দেখে নিই। তাদেরকে পথিমধ্যে এমন একটি নদী পার হতে হলো যে নদীতে বরফ গলা পানির ধারা প্রবাহিত হচ্ছিলো, যার কারণে তার পানি

ছিলো প্রচন্ড ঠান্ডা; এক দিকে আবহাওয়া ছিলো প্রচন্ড গরম ওদিকে পানি হলো প্রচন্ড ঠান্ডা, সব মিলিয়ে তারা পড়লো এক তথৈবচ অবস্থার মধ্যে। তাদের সেনাপতি ফ্রেডরিক বার্বারোজ ছিলো সত্তোরোর্ধ বয়সের বৃদ্ধ , লৌহ বর্ম দিয়ে তার শরীরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত আবৃত ছিলো। আসলেই কাফেররা কখনো মুসলমানদের মতো হালকা সরঞ্জামে যুদ্ধ করতে সাহস পায় না , ঠিক আল্লাহ তায়ালা যেভাবে বলেছেন

**لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ**

**তারা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়াল থেকে। তাদের নিজেদের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে এক ভয়াবহ শত্রুতা । তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবে; কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক বিবেক বুদ্ধিহীন সম্প্রদায়।** *(সূরা আল হাশর, আয়াত ১৪)*

হতে পারে এই দুর্গ বাঙ্কার, অত্যাধুনিক কোন ট্যাংক বা আর্মার্ড ভেহিকল বা সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত কোনো যুদ্ধ বিমানের ককপিট। একবার তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত জায়গা থেকে বের করে আনতে পারলে হয়েছে... ব্যস... খালাস.... তাদের অবস্থা শেষ।

একারণেই ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রহঃ বলেন, আকার আকৃতিতে সাহাবায়ে কেরামগন তাদের শত্রুদের চেয়ে বিশাল বড় কিছু ছিলেন না , তাদের সামরিক ট্রেনিং তাদের চেয়ে উন্নত ছিলো না, তাদের যুদ্ধাস্ত্র, সাজ সরঞ্জাম তাদের চেয়ে কখনোই বেশী ছিলো না বরং সব সময়ই কম ছিলো; কিন্তু তাদের ছিলো বিশাল এক অন্তর, ছিলো অন্তরের অটল অবিচল ধৈর্য ও সাহসিকতা, যা যুদ্ধের সব চেয়ে বড় ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র , কাফেরদের সেই অন্তর, সেই প্রধান অস্ত্র তখনই বিকল হয়ে যায় যখন তার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী।

সাহাবায়ে কেরামদের ছিলো এক বিশাল অন্তর, অটল অবিচল ধৈর্য ও সাহসিকতা, কারণ তারা জীবনের চেয়ে আল্লাহর পথে মৃত্যুকে বেশী ভালোবাসতেন ; পক্ষান্তরে কাফেরদের পক্ষে এই শক্তি অর্জন কখনোই সম্ভব নয়, কারণ তারা সব সময়ই জীবনকে সব কিছুর চেয়ে বেশী ভালোবাসে আর মৃত্যুতে চরম ভয় পায়; তাই মুসলমানদের মতো সাহসিকতা তারা কখনোই অর্জন করতে পারে না , চাই তাদের সাজ সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র ও ট্রেনিং যতোই উন্নত হোক না কেন। যুদ্ধ জয়ের আসল অস্ত্র অর্জন করা কখনোই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ফ্রেডরিক বার্বারোজ তার ঘোড়ায় চড়ে অল্প পানির দিয়ে নদী পার হচ্ছিলো, হঠাত তার ঘোড়াটি ভৌতিক কিছু একটা দেখে লাফানো আরম্ভ করলো, ফ্রেডরিক ঠান্ডা পানির মধ্যে পড়ে গিয়ে হার্ট এটাক করে সেখানেই মরে গেলো। ইমাম ইবনে আসীর রহঃ তার মৃত্যুর ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, জার্মান কিং ফ্রেডরিক মারা গেলো সামান্য হাটু পানিতে ডুবে ; অথচ ফ্রেডরিক বার্বারোজ ছিলো এমন একটি নাম যা শুনলে গোটা দুনিয়ার মানুষের হৃদয়ে কম্পন শুরু হয়ে যেতো , যে ছিলো ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী বীর যোদ্ধা ও প্রতাপশালী শাসক; আর তাকে আল্লাহ তায়ালা মারলেন হাটু পানিতে ডুবিয়ে।

জার্মান কিং এর মৃত্যুর পর তাদের ভিতরে অনৈক্য ছড়িয়ে পড়লো , এছাড়া দীর্ঘ যাত্রা ও প্রতিকুল আবহাওয়ার কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম রোগ ব্যধিও ছড়িয়ে পড়লো, এভাবে তারা যখন শাম দেশে গিয়ে পৌছলো তখন তাদের অবস্থা ছিলো এমন যেন তাদেরকে মাত্র কবর থেকে টেনে বের করে আনা হয়েছে; শুধু তাই নয় তারা যখন গিয়ে আল আক্কা গিয়ে পৌছেছিলো তখন তাদের সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে তিন লাখ থেকে নেমে দাড়িয়েছিলো মাত্র এক হাজারে। তিন লক্ষ থেকে মাত্র এক হাজার সৈন্য এসে পৌছেছিলো সালাহউদ্দীনকে মোকাবেলা করার জন্য আসা সৈন্যের বহর। এখন আপনিই বলুন, কে বুদ্ধিমান প্রমানিত হলেন? সালাহ উদ্দীন, না কি সেই সব আলেম ওলামারা যারা যুদ্ধের কথা শুনে কাপুরুষের মতো পলায়ন করেছিলো ?

এই ফ্রেডরিক বার্বারোজ সালাহউদ্দীনকে অহংকার ও দম্ভের সাথে চিঠি লিখে হুমকি দিয়েছিলো যে, সালাহউদ্দীন যদি বারো মাসের মধ্যে এই অঞ্চল থেকে তার সেনা বাহিনী প্রত্যাহার করে না নেয় তাহলে তাকে দেখে নেয়া হবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চাইলেন অহংকারী বার্বারোজকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে, আর তিনি তা একবারে সহজভাবেই করে ছাড়লেন; বার্বারোজ শপথ করেছিলো যে সে ফিলিস্তিনের পবিত্র মাটিতে পা রাখবেই, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে তার শপথটুকুও পূরণ করতে দিলেন না। বার্বারোজ যখন পবিত্র ভুমিতে আসার আগেই পথিমধ্যে মারা পড়লো তখন তার পুত্র তার পিতার শপথ পুরণ করার জন্য তার মৃতদেহকে ফিলি স্তিনে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করলো। সে তার মৃতদেহকে পানিতে সিদ্ধ করে ভিনেগার দিয়ে একটি ড্রামের মধ্যে রেখে দিলো যাতে তা পঁচে গলে না যায় এবং তার শপথটি যেন অন্তত পুরণ করা যায়; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে তার শপথ পুরণ করতে দিলেন না , তার লাশ পঁচে গলে ড্রামটা ফেটে গেলো, আর তার পুত্র অবশেষে বা ধ্য হলো তাকে পথিমধ্যে এক জায়গায় মাটি খুড়ে পুঁতে রাখতে। সে তার সামান্য শপথটকুও পূরণ করতে পারলো না।

অতএব হে কাফিররা, হে কাফিরদের দোসর মুনাফিকরা! তোমরা ভালো করে জেনে রাখো, আল্লাহর দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করতে যায় আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাদের পরিনতি এমনই করে থাকেন। তোমরা যারা (সন্ত্রাসের/জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে) ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছো (এবং মুসলিম নামধারী মুরতাদদের যারা এই যুদ্ধে তাদের দোসর হয়েছো) তাদের সকলের পরিণতি অবশেষে ফ্রেডরিক বার্বারোজের মতোই হবে।

ইবনে আসীর রহঃ বলেন আল্লাহ তায়ালা যদি নিজ দয়ায় নিজ কৌশলে উম্মতের কল্যাণের জন্য ফ্রেডরিক বার্বারোজকে হত্যা না করতেন তাহলে আজ হয়তো আমরা বলতাম অতিতে কোনো একটা সময় ছিলো যখন সিরিয়া ও মিশর মুসলমান দেশ ছিলো। পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ ছিলো যে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা দয়া করে যদি মুসলমানদেরকে বিজয় দান না করতেন তাহলে আমরা হয়তো মিশর ও শাম (জর্ডান, লেবানন ও সিরিয়া) গোটা অঞ্চলটাকেই হারিয়ে ফেলতাম এবং হয়তো আমাদেরকে বলতে হতো যে অতিতে একটা সময় ছিলো যখন সেখানে মুসলিমরা বসবাস করতো। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে বিজয় দান করতে চেয়েছেন; অতএব তারা তিন লক্ষ সৈন্য পাঠালো না তিন বিলিয়ন সৈন্য পাঠালো তাতে কিছু আসে যায় না। আল্লাহ তায়ালা যখন পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে চান, যদি কোনো অবস্থার সমাপ্তি চান, যদি এই উম্মাহকে বিজয় দান করতে চান তাহলে তিনিই এমন পরিস্থিতি তৈরী করবেন যা উম্মতের বিজয়কে তরান্বিত করবে।

# ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিঃ

আমরা এই দির্ঘ আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম যে আমাদের উল্লেখিত মুলনীতিটি একটি প্রমানিত সত্য মুলনীতি। আসুন এবার আমাদের বর্তমান যুগের অব স্থার উপর কিছু আলোকপাত করা যাক।

## *১ম পয়েন্টঃ*

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই বর্তমান সময়ের পরিস্থিতির সাথে সালাহউদ্দীন আইউবীর সময়কার পরিস্থিতির সাথেও অনেক মিল রয়েছে। তাহলে কি আমরা ধরে নেবো যে আমাদের পরবর্তী পরিস্থিতিও সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর পরবর্তী পরিস্থিতির মতো হবে? বিষয়টি বোঝার জন্য আসুন আমরা জেনে নিই সালাহউদ্দীন আইয়ুবী বিজয়ী হওয়ার পুর্বের পরিস্থিতি কেমন ছিলো।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পাই যে তৎকালিন সময়ে আলেম ওলামাদের মাঝে দলাদলি, ফিরকাবাজি ও মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল মারাত্মক আকার ধারণ করেছিলো। আলেমদের মধ্যে দলাদলি, খিলাফাতের মধ্যে ভাগাভাগি, সাধারণ জনগনের মধ্যে কোন্দল; মোট কথা মুসলমানদের অবস্থা মারাত্মক খারাপ পর্যায়ে এসে দাড়িয়েছিলো।

ঐতিহাসিক ইবনে আসির রহঃ বলেন, সে সময় খিলাফাহ মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলো, কেন্দ্রিয় খিলাফাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানরা ছোটো ছোটো রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো; বাগদাদের বাইরে কেন্দ্রিয় খিলাফাতের তেমন কোনো নিয়ন্ত্রন ছিলো না। বসরা নিয়ন্ত্রন করতো ইবন রাইক্, খুজিস্তান ছিলো আবু আবদুল্লাহর দখলে, পারস্য অঞ্চল ছিলো ইমাদুদ দৌলার নিয়ন্ত্রনে, কারমান অঞ্চল ছিলো আবু আলী বিন মুহাম্মাদের দখলে; মসূল, আল জাযিরা ও আদ দিয়া বাক্কার ছিলো রাবিয়া বিন হিব্বানের নিয়ন্ত্রনে, মিশর ও শাম ছিলো মুহাম্মাদ বিন বায্খ এর অধিনে, আফ্রিকা ও মাগরিব ছিলো আল ক্বাইম বিন মাহদির অধিনে, খোরাসান ছিলো আস সামানির নিয়ন্ত্রনে। এই চিত্রের মাধ্যমে আশা করি তৎকালিন অনৈক্যের একটি চিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। অনৈক্যের দিক থেকে আমাদের বর্তমান উম্মাহর অবস্থার সাথে তৎকালিন উম্মাহর একটা মিল খুজে পাওয়া যায়।

আমরা এখানে যে কথাটি বলতে চাই তা হলো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্ধ অংশ। উম্মাহ যেহেতু বর্তমানে অধঃপতনের শেষ সিমায় পৌঁছে গিয়েছে; অতএব এর পর উম্মাহর সামনে নিশ্চয়ই বিজয় অপেক্ষা করছে। তাই আমাদের বর্তমান দুরাবস্থার কথা ভেবে মোটেই হতাস হওয়া চলবে না, একথা মনে করা মোটেই ঠিক হবে না যে আমাদের এই অবস্থার মনে হয় কোনো শেষ নেই। মোটেই এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই, কারণ পতনের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলে তারপর কেবল উত্থানই বাকি থাকে, ব্যস এখন আমাদের সামনে ইনশাআল্লাহ বিজয়ই অপেক্ষা করছে।

ইবনে আসীর রহঃ মুসুলিম জাতির দলাদলীর আরো চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, শুধু আন্দালুসই চারটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এর প্রত্যেক রাষ্ট্র-নেতাই নিজেকে আমীরুল মুমিনীন বলে দাবী করতে থাকে এমন কি

আমীরুল মুমিনীনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি একটি হাস্য কৌতুকের বিষয়ে পরিণত হয়। ক্ষমতার মোহে তারা অন্ধ ও উন্মাদ হয়ে পড়েছিলো ঠিক যেমন বর্তমান সময়ের শাষকরা ক্ষমতার মোহে অন্ধ। ক্ষমতার মোহ তাদেরকে কেমন উন্মাদ করে তুলেছিলো তার একটি উদাহরণ হলো শাষক আর রিদওয়ান ; সে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য নিজের আপন দুই ভাইকে হত্যা করে ফেলে এবং নিজের মসনদ ঠিক রাখতে গিয়ে সে পথভ্রষ্ঠ বাতেনী সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য চায়।

এর আর একটি উদাহরণ হলো- আর রাহা শহরটি দুই আমীরের নেতৃত্বে দুই ভাগে বিভ ক্ত হয়ে পড়লে তাদের একজন আমীর বিধর্মী রোমান সম্রাটের কাছে অন্য আমীরের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার আবেদন জানায়। এমন ফিৎনা ফাসাদের সময় কুরতুবা নগরীতে উমাইয়্যা বিন আবদুর রহমান বিন হিশাম নামক এক ব্যক্তি রাজপ্রাসাদের দখল নিয়ে প্রধান ফটকে এসে চিৎকার করে বলতে থাকে যে সে-ই হলো এখন এই রাজ্যের আমীর। কেউ একজন তাকে উপহাস করে বলে যে শোনো উমাইয়্যাদের দিন এবার শেষ। তখন সে বলতে থাকে, এক দিনের জন্য হলেও তোমরা আমাকে বাইয়াত দাও, আমাকে একটু আমীর হওয়ার স্বাদ আস্বাদন করতে দাও, তারপর তোমরা চাইলে একদিন পর আবার আমাকে হত্যা করে ফেলো। এতোটুকু পেলেও আমি স ন্তুষ্ট হয়ে যাবো।

বর্তমান সময়ের মতো ধনী গরীবের ব্যবধানও তখন সমাজে মারাত্মক আকার ধারণ করেছিলো, এক দিকে সমাজের ক্ষুদ্র একটি শ্রেণী বিত্তের পাহাড় গড়ে তুলেছিলো আর অন্য দিকে সাধারণ মানুষদের এক বিরাট অংশের অবস্থা ছিলো নুন আনতে পান্তা ফুরায়। ধনীদের বিলাসিতা আর দুনিয়া পুজা র একটি উদাহরণ হলো সুলতান মিনিকশাহ; তার মেয়ের বিয়েতে যে মোহর ও উপঢৌকন দেয়া হয়েছিলো তার পরিমান ছিলো একশত ত্রিশটি উট বোঝাই স্বর্ণ্য ও রৌপ্য। অথচ সেই একই সমাজে মানুষের দারিদ্রতা এতো চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে তাদের কেউ কেউ ক্ষুধার যন্ত্রনায় কুকুরের মাংস খেতে বাধ্য হয়েছে। ৪৪৮ হিজরীতে মানুষের খাদ্যাভাব এমন চরমে পৌছেছিলো যে সামান্য বিশ পাউন্ড গমের বিনিময়ে এক ব্যক্তিকে তার মাথা গোজার আশ্রয় বাড়ি ঘর ভিটে মাটি বিক্রি করতে হয়েছে। এই সময়ে উম্মতের মধ্যে কর্মবিমুখতা , স্থবিরতা ও অলসতাও মারাত্মকভাবে জেকে বসেছিলো।

ইমাম ইবনে আসীর রহঃ তার আল কামিল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে রোমানরা ৩৬১ হিজরীতে রাহা নগরী আক্রমন করলে রাহা নগরী থেকে সাহায্যের আবেদন নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল বাগদাদে মুসলিম খলিফা বখতিয়ার উবাইহীর নিকট গমন করে। তারা গিয়ে দেখতে পায় যে তিনি শিকার করা নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তাদের অভিযোগ শোনার সময় তার নেই। এই ছিলো মুসলিম শাষকদের অব স্থা, যেখানে তার দায়িত্ব ছিলো মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করার জন্য রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সেখানে তিনি ব্যস্ত আছেন শিকার নিয়ে। এটা আসলে নতুন কিছু নয়, উম্মতের সাথে এমন উপহাস দুনিয়া পুজারী শাসকদের দ্বারা সব সময়ই হয়েছে।

এই তো সেদিনের কথা, আমার স্পষ্ট মনে আছে; কোনো একজন আরব বাদশাহ এসেছিলেন আমেরিকার ওয়াশিংটন ডি সি সফর করতে। সেখানে স্থানীয় মুসলিম সমাজের লোকজনের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তার পূর্ব নির্ধারিত দিন ছিলো মঙ্গলবার, মুসলমানগন অনেক দিন থেকে এই অনু ষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন রকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন, তারা শুধু অপেক্ষা করছিলেন কবে মঙ্গলবার আসবে ; হঠাত এক দিন আগে দূতাবাস থেকে জানিয়ে দেয়া হলো যে মঙ্গলবার দিন বাদশাহ অন্য একটি জরুরী মিটিংয়ের কারণে মুসলিম কমিউনিটির সাথে

নির্ধারিত অনুষ্ঠানে আসতে পারবেন না। লোকেরা ভাবলো যে হয়তো নিশ্চয়ই আমেরিকা প্রশাসনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারো সাথে এমন কোনো জরুরী কাজ পড়ে গেছে যেটা হয়তো তার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়, হতে পারে সেই মিটিংটা মুসলমানদের জন্য এই অনুষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আফসোস এই জাতির জন্য! পরবর্তিতে পত্রিকায় খবর বের হলো যে বাদশাহ সেদিন স্ত্রীকে নিয়ে একাধারে চার চারটি সিনেমা দেখার মহা আনন্দ উপভোগ করেছেন। তিনি একটা সিনেমা থেকে আরেকটা সিনেমায় যাওয়ার জন্য এতো ব্যাস্ত ছিলেন যে তার পক্ষে মুসলিম কমিউনিটির মিটিংয়ে আসা সম্ভব হয়নি !

এই ঘটনা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে মুসলিম উম্মাহ তাদের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব যাদের হাতে অর্পন করেছে উম্মাহর প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ, আন্তরিকতা ও ভালোবাসা কি পরিমান! এরা তো এমন ব্যক্তি যাদেরকে একটি মুদী দোকান চালানোর ব্যাপারেও বিশ্বস্ত মনে করা যায় না; অথচ তারা রাষ্ট্রপ্রধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসন 'অলংকৃত' করে বসে আছেন! গোটা উম্মাহর ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে বসে আছেন; আবার এই উম্মাহর মধ্যে এমন বেকুবও আছে যারা বলে থাকে যে আমাদের উচিত এই শাসকদেরকে বাইয়াত দেয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলা।

যাই হোক চলুন আবার ফিরে যাই সেই বাগদাদের ঘটনায়।

রাহা থেকে প্রতিনিধি দল বাগদাদে এসে খলীফাকে দেখলো তিনি শিকার করায় ব্যস্ত, তারা খলিফাকে বুঝালেন যে মুসলমানদের এই দুঃসময়ে শিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত নয় , তার উচিত রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা। খলীফা একথা শুনে বললেন আল্লাহু আকবার! আসলেই তো আমার যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত , কিন্তু যুদ্ধ করতে তো অর্থ দরকার, তোমরা অর্থ সংগ্রহ করো। মুসলমানরা খলিফাকে অর্থ সংগ্রহ করে দিলো, অথচ সে সেই সমুদয় অর্থ তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করে ফেললো আর জিহাদের কথা বেমালুম ভুলে গেলো।

ইবনে আসীর রহঃ আরো বলেন যে, যখন ক্রুসেডাররা শাম আক্রমনের পরিকল্পনা করে তখন লেবাননের ত্রিপলি থেকে বিখ্যাত আলেম কাযী আবু আলী ইবন আম্মার বাগদাদে গমন করেন জনগনকে তাদের সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে, কেননা প্রতীকী অর্থে হলেও বাগদাদকে তখনো খিলাফাতের কেন্দ্র মনে করা হতো। কাযী আবু আলী বাগদাদের কেন্দ্রিয় মাসজিদে এক জালাময়ী ভাষণ দেন, তিনি জনগনকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন। জনগনও তার বক্তৃতা শুনে বেশ উদ্বুদ্ধ হয় এবং তারা মুসলিম বাহিনীর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য নিজেদের প্রস্তুতি গ্রহণ আরম্ভ করে। আর সুলতানও কাযী আবু আলীকে প্রতিশ্রুতি দেয় তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠানোর। কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় খলীফার গাফলতির কারণে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি এবং কোনো বাহিনীও পাঠানো হয়নি, আর জনগনও বিষয়টিকে বেমালুম ভুলে গেলো। এদিকে কাযী আবু আলী নিজ এলাকায় ফিরে দেখতে পান যে তার অনুপস্থিতিতে শিয়া উবায়দিয়িনরা তার নিজ শহর ত্রিপলিও দখল করে নিয়েছে।

সুতরাং শাসক শ্রেণীর এমন ভোগ বিলাস, দুনিয়া পুজা ও ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যদি দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নেই, এটা নতুন কোনো বিষয় নয়, এটা অতিতেও হয়েছে এবং তখনও আল্লাহ তায়ালা এই উম্মাতকে রক্ষা করেছেন এবং বর্তমান এই অবস্থাও তিনি পরিবর্তন করে এই উম্মাতকে রক্ষা করবেন।

## *দ্বিতীয় পয়েন্টঃ*

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা উম্মাতকে ভবিষ্যত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করছেন। ইমাম ইবনে কাসীর রহঃ রচিত একখানা কিতাব রয়েছে যার নাম হলো 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া', তার এই কিতাবে গোটা মানবজাতির ইতিহাস, শুরু থেকে শেষ, আদি থেকে অন্ত, পৃথিবী সৃষ্টি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ের বিষদ আলোচনা রয়েছে। এই কিতাবে শেষ যামানায় ঘটিতব্য ফিৎনা ফাসাদ সম্পর্কে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে এক অধ্যায়ে সংকলন করেছেন। এই অধ্যায়টিকে আলাদা করে শুধু আল ফিতান নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

যদিও উম্মতের ভবিষ্যত উত্থান হবে সামগ্রিক উত্থান এবং গোটা উম্মতের উত্থান, তথাপিও ফিতান অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদীসগুলো প্রমান করে যে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উত্থানের ক্ষেত্র হিসেবে কোনো কোনো এলাকার উপর অন্য এলাকার চেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেসব এলাকার উপর আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে ইরাক। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইরাকীরা ইমাম মাহদীর নিকটতম হবে।[7]

এর পর রয়েছে খোরাসান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা দেখবে খোরাসান থেকে কালো পতাকা আসছে তখন তোমরা তাদের সাথে যোগ দিবে কেননা তাদের মধ্যেই আল্লাহ্র খলীফা মাহদী থাকবেন।[8]

এরপর রয়েছে শাম, বহু হাদীসে শামের ব্যাপারে অনেক কথা বলা হয়েছে; আর শাম হলো গোটা ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেন এবং জর্দান অঞ্চল নিয়ে গঠিত।[9]

এই মাত্র বিশ বসর আগেও এই সব অঞ্চলের অবস্থা কি ছিলো? ইরাকে ছিলো বাথ পার্টির শাসন, যারা শাসনতান্ত্রিক ভাবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং রাষ্ট্রিয়ভাবে তাদের অবস্থান ছিলো ধর্মের বিরুদ্ধে। গোটা আরব অঞ্চলের মধ্যে ইরাকীরা ছিলো আল্লাহর দ্বীন থেকে সব চেয়ে দুরে। তারা মনে প্রানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাথ পার্টিকে গ্রহণ করেছিলো এবং তারা ছিলো চরম জাতিয়তাবাদী। আমি আক্ষেপ করে এক সময় বলতাম আল্লাহই ভালো জানেন কবে এবং কিভাবে এদের অবস্থার পরিবর্তন হবে, আমার ধারণা ছিল এই ইরাক পরিবর্তন হতে যুগ যুগ সময় লেগে যাবে। সুবহান আল্লাহ মাত্র কয়েকটা বসরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ইরাকের মাটিকে কিভাবে ইসলামের জন্য প্রস্তুত করে দিলেন।

---

[7] *এখানে ইমাম আওলাকী তার বক্তব্যে উল্লিখিত হাদিসটির মুল আরবী উল্লেখ করেননি; তবে ফোরাত নদীর তীরবর্তী দেশ ইরাকের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যেসব হাদিস পাওয়া যায় তা তার বক্তব্যকে সমর্থন করে। যেমন ইমাম আহমদ রহঃ তার মুসনাদে ১৬৯৪২ ও ২২৩৮৮ নং হাদিসে ইবনে হাওয়ালা রাঃ এর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে রসুলুল্লাহ সঃ বলেছেন ঘটনাটি হবে এমন যে হবে তোমাদের মধ্যে অনেক যোদ্ধার আবির্ভাব ঘটবে, যোদ্ধারা থাকবে শামে, ইয়েমেনে এবং ইরাকে। হাদিসটির সনদ সহীহ, ইমাম আবু দাউদ রঃ হাদিসটি সংকলন করেছেন, ইমাম ইবনে কাসীর, ইবনে আসাকির ও ইমাম মুনযিরীও হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।*

[8] *ওয়াকী, শারিক, আলী বিন যায়েদ, আবু ক্বালাবাহ থেকে সাওবান রাঃ এর সুত্রে ইমাম আহমদ হাদিসটি সংকলন করেছেন; কিন্তু বেশ কিছু কারণে হাদিস বিশারদ্গান হাদিসটিকে এই সনদে যইফ আখ্যা দিয়েছেন। তবে ইমাম বাযযার তার মুসনাদে আব্দুর রাযযাক সানআনী, সাওরী, খালেদ আল হিযা, আবু ক্বালাবা, আসমা আর রাহবি এর পিতা থেকে সাওবান রাঃ এর সুত্রে হাদিসটি বর্ণনা করে তিনি একে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন।*

[9] *শাম অঞ্চলের বারাকাহ ও এর বৈশিষ্ট্য এবং মুসলিম জাতীর উত্থান পতনের সাথে এ অঞ্চলের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে অসংখ্য সহীহ হাদিস বর্ণীত রয়েছে, আগ্রহী পাঠকদেরকে হাদিসগ্রন্থসমুহের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় দেখে নেয়ার অনুরধ করছি।*

খোরাসানে (আফগানিস্তান অঞ্চল) জিহাদ আরম্ভ হওয়ার আগে সেটা ছিলো একটি কমিউনিস্ট দেশ। আচ্ছা বলুন তো, কমিউনিজম থেকে ইসলামের জন্য কি কল্যাণ আশা করা যেতে পারে? আশির দশকের শুরুর দিকে এই খোরাসান অঞ্চলে প্রথম জিহাদের খবর প্রচার হওয়া আরম্ভ হয়।

শামের কেন্দ্র বিন্দু হলো ফিলিস্তিন, এই তো সেদিন এই ফিলিস্তিনিরা আল্লাহকে এবং ইসলামকে অভিশম্পাত করতো। তাদের খ্যাতি ও শুনাম ছিলো দুর্নীতি আর মদ্যপানে, এটা ছিলো ফিৎনা ফাসাদে ভরা একটি রাষ্ট্র। সিরিয়া ছিলো বাথ পার্টির নিয়ন্ত্রনে। লেবাননকে বলা হতো মধ্যপ্রাচ্যের প্যারিস, এটা ছিলো একটা পার্টি জোন, আরবরা যখন কোনো পার্টি করতে চাইতো তখন তারা বৈরুত চলে যেতো। ইয়েমেন সম্পর্কিত হাদিসটিতে ইয়েমেনের যে অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে সেটা হলো দক্ষিণ ইয়েমেনের অঞ্চল আদনে আবিয়ান, আর এটিই ছিলো আরবের একমাত্র পরিপূর্ণ কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। হাদীসে বর্ণীত এসব অঞ্চলগুলোর অববস্থার কথা ভেবে এই সেদিনও আমি ভাবতাম বিজয় বহু দুরে এবং আমার জীবনে তা দেখে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

সুবহান আল্লাহ! মাত্র বিশ বসরের ব্যবধানে কি আশ্চর্যজনক পরিবর্তনই না সাধিত হয়েছে এসব অঞ্চলে, কতো দ্রুত আমরা কতো পরিবর্তিত অবস্থায় এসে দাড়িয়েছি।

প্রথম জিহাদ আরম্ভ হয় ফিলিস্তিনে, আসলে উম্মতের এই পুনরুত্থানের যুগে ফিলিস্তিনই প্রথম শাহাদাতের গুরুত্বকে পুনরুজ্জিবীত করেছে। ফিলিস্তিনে আজকাল শাহাদাত তাদের সামাজিক সংস্কৃতির একটা অংশে পরিণত হয়েছে এবং সাধারণ জনগণ শাহাদাতকে বিবাহ অনুষ্ঠানের মতো উদযাপন করে। এখন সেখানে কোনো যুবক যখন আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করে তখন তার পরিবারের লোকেরা একটি তাবু টানায় এবং অন্যান্য লোকেরা এসে সেই পরিবারকে স্বাদর সম্ভাষণ জানায়, যেন তাদের সন্তান নতুন বিবাহ করেছে। যে এলাকার লোকেরা ছিলো আল্লাহর দ্বীন থেকে সব চেয়ে দুরে তারাই কিনা দ্বীনের সর্বোচ্চ আমল শাহাদাতকে পুনরুজ্জীবিত করলো। তারাই প্রথম আমালুল ইস্তেশহাদী (শয়তানদের ভাষায় আত্মঘাতি) বা শাহাদাহকামী আক্রমন আরম্ভ করেছে এবং এই মহান আমলকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

আফগানিস্তান- যেটি এই সেদিনও ছিলো একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র সেই দেশটিই কিনা হয়ে উঠলো জিহাদের মারকায। আমার মনে হয় দুনিয়াতে বর্তমান যতো স্থানে জিহাদ চলছে আফগানিস্তানের সাথে তার কোনো না কোনো যোগসুত্র অবশ্যই খুজে পাওয়া যাবে। এক কথায় বলা যায় আফগানিস্তান হলো বর্তমান যামানার মহান জিহাদী আমলের সুতিকাগার। চিন্তা করে দেখুন তো একটি কমিউনিস্ট দেশ - যেখানে গোটা মুসলিম বিশ্বে শিক্ষার হার সবচেয়ে নিচে, যে লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে তেমন জ্ঞানও রাখতো না, তারাই আবির্ভুত হলো গোটা মুসলিম উম্মাহর কান্ডারী হিসেবে। তারা কোনো তথাকথিত বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ও বিখ্যাত আলেম ওলামা ও নন যাদেরকে হর হামেশা স্যাটেলাইট চ্যানেলে দেখা যায়; অথচ তারাই এই বিংশ শতাব্দিতে হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ জিহাদকে পুনরুজ্জিবীত করেছে, তাদের মাধ্যমেই জিহাদের পথে মানুষের পুনর্জাগরণ হয়েছে। শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহঃ মতো মহান মুজাহিদদের ইলম অফগানিস্তান থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

ইরাকের কথাটা একটু ভেবে দেখুন, এই কয়েক বছর পুর্বেও কি কেউ ভাবতে পেরেছে যে ইরাক জিহাদী আমলের ক্ষেত্রে পরিণত হবে! কে ভাবতে পারতো যে সাদ্দামের মতো নাস্তিকের দেশটা জিহাদের পুন্য ভুমিতে পরিণত হবে। এমনকি আমেরিকানরাও ভাবতে পারেনি, তারা ভেবেছিলো যে বাগদাদে তাদেরকে লাল গালিচা সম্বর্ধনা দেয়া

হবে, তাদের পথে ফুল বিছিয়ে স্বাগতম জানানো হবে । সুবহান আল্লাহ! অথচ এই ইরাক এখন মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ জিহাদের ময়দানে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরাকের ভুমিকে পৃথিবীর ভবিষ্যত পট পরিবর্তনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে প্রস্তুত করছেন। বারো বছরের অবরোধ এবং প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ ছাড়া ইরাকী জনগণও মুজাহিদ রূপে আবির্ভূত হতো না এবং ইরাকও একবিংশ শতাব্দির মুজাহিদদের যুদ্ধ ফ্রন্ট হিসেবে প্রস্তুত হতো না। আল্লাহ তায়ালা ইরাকী জনগনকে প্রস্তুত করার জন্য একাধিক বুয়াস সংগঠিত করেছেন; কেননা সাদ্দাম হোসেনের বর্তমানে ইরাকে এমন পরিবর্তন সম্ভব ছিলো না; তাই আল্লাহ তায়ালা আগে তাকে নির্মুল করেছেন, ইরাককে নেতৃত্ব শূন্য করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আমেরিকানদেরকে দিয়ে এই কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, তারা এসেছে সাদ্দামকে উৎখাত করেতে; অথচ বুঝতেই পারেনি যে কোন ভিমরুলের চাকে তারা ঢিল ছুড়েছে, কোন মরনফাদে তারা পা দিয়েছে। তারা সাদ্দামকে উৎখাত করেছে আর আল্লাহ তায়ালা আমেরিকার আতঙ্ক আবু মুসাব আল জারাকাবী রহঃ কে নেতৃত্বে নিয়ে এসেছেন[10], আমেরিকানরা তাদেরকে আরো ভয়ংকর সমস্যার মধ্যে নিমজ্জিত করলো। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন হয়তো এই হাটু পানিতে ডুবেই আমেরিকার সলীল সমাধী হবে।

দক্ষিণ ইয়েমেন, যেটি ছিলো আরবের কমিউনিস্ট এলাকা, সেটিই এখন ইসলামের পুনর্জাগরণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যে অঞ্চলটি এই পুনর্জাগরণের কেন্দ্র সেটি হলো 'আদনে আবিয়ান' অঞ্চল। এটিই সেই বিশেষ এলাকা যার কথা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হাদিস সমূহে উল্লেখ করেছেন।

আমরা যদি একটু মনোযোগের সাথে লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাবো মাত্র বিগত বিশ বসরের সামান্য সময়ের মধ্যে এই এলাকাসমুহে অব স্থার কি আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এসব ঘটনা প্রবাহ কি আমাদেরকে চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না যে উম্মাহর বিজয় অতি সন্নিকটে। অবস্থার এই পরিবর্তন কি প্রমান করে না যে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব অঞ্চলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেসব অঞ্চলগুলোকে আল্লাহ তায়ালা সমাগত ভবিষ্যত পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত করছেন? ইরাক, খোরাসান, শাম এবং ইয়েমেনকে আল্লাহ তায়ালা প্রস্তুত করছেন পরবর্তি অবস্থার জন্য। আর পরবর্তী অবস্থা কী? সেই পরবর্তী অবস্থা হলো 'আল মালহামা' (অর্থাত ঈসা আলাইহিস সালাম ও দাজ্জালের মধ্যে সংঘটিতব্য যুদ্ধ যে যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হবে)। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সকল অঞ্চলের আলোচনা এনেছেন ইমাম মাহদী ও মালহামা প্রসঙ্গে।

আল মালহামা হলো সেই মহা যুদ্ধ যা সংগঠিত হবে মুসলিম জাতি ও রোমানদের তথা পশ্চিমাদের মধ্যে এবং এর পরই মুসলমানরা বিশ্বব্যপী খিলাফাহ ব্যবস্থা কায়েমে সক্ষম হবে। কারণ আমাদের বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি বুঝতে হবে। এখন আর নিছক আঞ্চলিক বলতে তেমন কিছু নেই , আমরা এখন গ্লোবাল ভিলেজ বা বৈশ্বিক গ্রামে বসবাস করছি, এখানে আর আংশিক বিজয়ের কোনো সুযোগ নেই; বিজয় হলে বিশ্বব্যাপি বিজয় আর হারলে বিশ্বব্যাপি হার। অবস্থা এখন আর এমন নেই যে আপনি ছোট্ট কোনো একটি এলাকা জয় করে সেখানে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করে নিরাপদ থাকবেন। না, কিছুতেই এটা এখন আর সম্ভব নয়। বিশ্ব তাগুত আমেরিকা ও তার

[10] *শাইখ এ বক্তব্য যখন দিয়েছেন তখনও এ যামানার মহান মুজাহিদ শহীদ আবু মুসাব আল যারকাবী রহঃ জীবিত ছিলেন, আল্লাহ্ তায়ালার মেহেরবানীতে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করে চলে গেছেন, কিন্তু ইরাকের মাটিতে আল্লাহ্র রহমতে তিনি রেখে গেছেন তার মতো অসংখ্য যারকাবীকে যারা কাফিরদেরকে এখনো নিয়মিত জাহান্নামে পাঠিয়ে চলছেন, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সহায় হন। অনুবাদক*

দোসরদের ঔদ্ধত্য ও যুলুম নির্যাতন এমন প্রকট আকার ধারণ করেছে যে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন তারা খুঁজে বের করে আপনাকে নির্মুল করে দেয়ার জন্য সর্ব শক্তি নিয়োগ করবে। মানুষেরা মহাকাশ বিদ্যা ও আকাশ পথে আক্রমনে ব্যপক ক্ষমতা অর্জনের পূর্বের পরি স্থিতি ছিলো ভিন্ন রকমের; তখন একটি পাহাড় দখল করে দূর্গ নির্মান করে যুগের পর যুগ নিরাপদে কাটিয়ে দেয়া যেত। কি ন্তু এখন এরকম হলে তারা বি-৫২ বিমান পাঠিয়ে আপনাকে আপনার দুর্গ সহ নির্মূল করে দিতে মোটেও বিলম্ব করবে না।

ভবিষ্যত যুদ্ধে হয় সামগ্রিক বিজয় অর্জন করতে হবে অথবা সামগ্রিক পরাজয় বরণ করতে হবে। আর এটাই হলো আল মালহামার অংশ। এটাই হবে ঈমান ও কুফরের মধ্যে চুড়ান্ত যুদ্ধ , এটাই সেই যুদ্ধ যা এই উম্মাহকে বিজয় দান করবে। তবে এখানেই শেষ নয়, কারণ এখনো দাজ্জাল রয়ে গেছে, আরো রয়ে গেছে ইয়াজু জ মাজুজ। কিন্তু এটাই হলো সেই যুদ্ধ যার মাধ্যমে বিশ্বব্যপি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে।

অতএব এটা হলো এমন ইঙ্গিত যা প্রমান করে যে আমরা সেই সময়ের একান্ত নিকটে এস পড়েছি। আর সওয়াব অর্জনের এই সোনালী সময়ে দর্শক সারিতে দাড়িয়ে থেকে আমরা যদি অসাধারণ সওয়াব অর্জনের এই সুযোগকে হেলায় হারাই তাহলে আমাদের মতো নির্বোধ আর কাকে বলা যাবে! এটা আসলেই সোনালী সময়, সাহাবায়ে কেরামগন এই সময়ের সওয়াবের বর্ণনা শুনে আকাংখা প্রকাশ করতেন যে আহ! আমরা যদি ঐ সময়ে বেচে থাকতাম! আমরা হতভাগারা এই সোনালী সুবর্ণ সময়ে বসবা স করা সত্তেও নিরব দর্শকের ভুমিকায় অভিনয় করছি। এজন্য শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহঃ বলতেন, জিহাদ একটা মার্কেটের মতো, এটা যখন খোলা হয় তখনই কেনা বেচা করে ব্যবসা করে নিতে হয়, মার্কেট যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন হা হুতাশ করে কোন লাভ নেই। যখন মার্কেট খোলা থাকে তখন যদি তোমরা পেছনে পড়ে থাকো, ইতস্ততঃ করো, অনাগ্রহ প্রকাশ করো তাহলে তোমরা এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ হারা বে যা তোমাদের জীবনে আর ফিরে নাও আসতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে এটা যেহেতু জিহাদের সোনালী সময় সেহেতু এর সওয়াবও পরিশ্রম ও ত্যাগ তিতিক্ষা ছাড়া এমনিতেই পাওয়া যাবে না। কারণ একাজের বিনিমিয় যেমন সবচেয়ে বড় তেমনি একাজ যে ত্যাগ দাবী করে সে ত্যাগও নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় হবে। একারণে যেন তেন লোকেরা এই ত্যাগ স্বীকারও করতে পারবে না এবং এই বিনিময়ও অর্জন করতে পারবে না। উত্তম ঈমানদারদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা যাদেরকে পছন্দ করবেন তারাই কেবল এই ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে এবং তারাই কেবল এই মর্যাদা অর্জন করতে পারবে।

## ফিৎনার ভয়াবহতা উপলব্ধি করাঃ

### *প্রথম ইঙ্গিতঃ*

আল মালহামাতে রোমানদের তথা পশ্চিমা শক্তির সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যারা আসবে তাদের ব্যপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তাদের এক তৃতিয়াংশ যুদ্ধ থেকে পলায়ন ও পশ্চাদপসরণ করবে। কি ভয়াবহ অবস্থা হবে চিন্তা করুন তো! কারণ এরাই হলো উম্মাহর সর্বোত্তম লোক, কারণ কেবল ঈমানদাররাই এই যুদ্ধে অংশগ্রহনের জন্য বের হতে পারবে; অথচ তাদেরই এক তৃতিয়াংশ আবার কিনা পশ্চাদপসরণ করবে! আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যপারে বলেছেন যে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা কখনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না। এরা তো সেই ঈমানদার যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে বের হয়েছে, এরাই তো সেই মুজাহিদ যারা এই যুদ্ধকে এত দুর এগিয়ে নিয়ে এসেছে; কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে যেহেতু তারা পশ্চাদপসরণ করেছে সেহেতু আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাদের তাওবা কবুল করবেন না। এমন ভয়াবহ হবে সে ফিৎনা[11]।

এই ভয়াবহ ফিৎনার সময়ে অনেক মযবুত ও শক্তিশালী ঈমান ছাড়া আল্লাহর দ্বীনের উপর টিকে থাকা মোটেই সম্ভব নয়। এটা যেন বিশাল মরুভূমি পাড়ি দেয়ার মতো, এখানে গাড়িতে কতোটুকু ফুয়েল আছে , পরিপূর্ণ ভরা আছে, না অর্ধেক আছে, না চার ভাগের এক ভাগ আছে এটা কোনো বিষয় নয়। যেভাবেই হোক মরুভুমি সম্পূর্ণ পাড়ি দিতে হবে। শেষ সীমানায় পৌঁছার আগে যদি গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় তাহলেই মত্যু অনিবার্য। এখানে আশি ভাগ রাস্তা পার হওয়া আর ত্রিশ ভাগ পার হওয়া একই কথা, শেষ সীমানায় না পৌঁছা মানেই নির্ঘাত মৃত্যু।

শেষ যামানার এই ঈমানদারদের ব্যপারও একই রকম, এখানে সফলতার জন্য পরিপূর্ণ ঈমান থাকতে হবে। এখানে আধা ঈমান বাস্তবে ঈমান না থাকারই শামিল। এটা বিশেষ সময় এবং বিশেষ মর্যাদা। এই বিশেষ মর্যাদা, এই বিশেষ সম্মাননা তো কেবল তাদেরই প্রাপ্য যারা ঈমানের মযবুত ও শক্তিশালী স্তরে নিজেদেরকে উন্নিত করতে পেরেছেন। আমরা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কাছে দোয়া করি যেন তিনি আমাদেরকে সেই দলের অন্তর্ভূক্ত করে নেন।

### *২য় ইঙ্গিতঃ*

আমরা যে সেই শেষ সময়ের কাছে চলে এসেছি তার আর একটি ইঙ্গিত হলো কিছু বছর যাবৎ লক্ষ করা যাচ্ছে যে পশ্চিমা বিশ্বে (ইহুদী খৃষ্টান) মৌলবাদী চরমপন্থিদের উত্থান আরম্ভ হয়েছে এবং রাষ্ট্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে ধর্মের ব্যবহারও তাদের মধ্যে বেড়েছে। কিছু দিন পুর্বে নিউজ উইকে বুশ এবং গড সম্পর্কে একটা প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে সেখানে প্রতিবেদক কিছু ইউরোপিয়ান পন্ডিতদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন ; যাদের বক্তব্যের সার মর্ম হলো আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির অনেক বহুমুখী লক্ষ উদ্দেশ্য ও নী তিগত বৈচিত্র রয়েছে এবং এই তারতম্য নিয়ন্ত্রনে যে নীতিগুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে ধর্ম একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমেরিকার ইতিহাসে এই প্রথম আমাদের মনে হচ্ছে যে ধর্মভিত্তিক কিছু লক্ষ উদ্দেশ্য অর্জন আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির মুল

---

[11] *এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহঃ সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাঃ এর বর্ণনায় আল ফিতান ওয়া আশরাতু সা-আ'হ অধ্যায়ে কুসতুনতুনিয়া বিজয়, দাজ্জালের আবির্ভাব ও ঈসা আঃ এর অবতরণ পরিচ্ছদে সংকলন করেছেন, ইমাম আওলাকীর বক্তব্য এ সহীহ হাদিসের দ্বারা সমর্থিত।*

লক্ষ উদ্দেশ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং ধর্মই এক্ষেত্রে প্রায় গোটা পররাষ্ট্র নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বুশ তো একবার ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসকে একথাই বলেছিলো যে "গড আমাকে আফগানিস্তানে যেতে বলেছেন"। সুতরাং তার বক্তব্যমতে সংবিধান, কংগ্রেস বা আমেরিকার জনগণ নয় বরং তার গড তাকে এই যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।

দেখুন ডেনমার্ক- যে দেশটি কিনা ইউরোপের সবচেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের দাবীদার দেশ অথচ সেখান থেকেই আল্লাহর রসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আক্রমন আরম্ভ হলো। ইতিপুর্বে চিন্তাই করতে পারেনি যে ডেনমার্কের মতো ছোট্ট একটা দেশ এতো মারাত্নক একটা অপরাধের কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হবে। এবং আমরা দেখতে পাই নির্লজ্জভাবে গোটা ইউরোপ এহেন জঘণ্যতম অপরাধের হোতা ডেনমার্কের পক্ষ অবলম্বন করলো। গোটা ইউরোপ যে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ এবং এক্ষেত্রে তারা কোনো ভদ্রতা, সভ্যতা ও যুক্তি বুদ্ধির ধার ধারে না তা আর একবার প্রমান হয়ে গেলো। পশ্চিমা দেশগুলি রাষ্ট্রিয়ভা বে এই অপকর্মকে সমর্থন দিয়েছে এবং পশ্চিমা জনগনও যে একে সমর্থন দিয়েছে এটা কোনো গোপন বিষয় নয় বরং প্রকাশ্যেই তারা একাজ করেছে। যার কারণে আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কার্টুন প্রকাশকারী সেই ওয়েব সাইটটি বন্ধ করে দেয়ার 'অপরাধে' সুইডিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রিকে তার মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। জনগনের প্রবল চাপে এবং সরকারী সিদ্ধান্তে তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছে।

ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যপার যখন আসে তখনই পশ্চিমারা মারাত্নক ধর্মভীরু বরং চরমপন্থি মৌলবাদীদের মতো আচরণ করে। মুসলমানদের প্রসঙ্গ আসলেই তারা যেন হঠাৎ করে মারাত্নক ধর্মভীরু হয়ে যায়, অথচ বাস্তবে তারা তো ধর্মের বারান্দা দিয়েও হাটে না; এমনকি তাদের বর্তমান (বিকৃত) বাইবেলের শিক্ষাও গ্রহণ করে না।

### *৩য় ইঙ্গিতঃ*

আপনি দেখতে পাবেন ইদানিং পশ্চিমা ধর্মপ্রচারকরা ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ আক্রমনাত্নক মন্তব্য করছে। যেমন আমেরিকাতে বিলী গ্রাহাম এর পুত্র ফ্রাঙ্কালিন গ্রাহাম বলেছে যে ইসলাম হলো শয়তানের ধর্ম। প্যাট রবার্টসন দাবী করে বসলো যে মুসলমানরা হলো ইয়া জুজ মাজুজ।

এই ধরণের মন্তব্য দিনে দিনে বেড়েই চলছে, কমছে না। এটা প্রমান করে যে আমরা আল মালহামার নিকটবর্তী হয়ে যাচ্ছি, কারণ এসব মন্তব্যের মাধ্যমে একটা মানসিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। যে কোনো যুদ্ধ অস্ত্রের ময়দানে গড়ানোর আগে অন্তরের ময়দানেই আরম্ভ হয়। যুদ্ধের আগে জনগণের মনোবল চাঙ্গা করার দরকার হয়, আর পশ্চিমারা এসব মন্তব্যের মাধ্যমে তাদের জনগনকে একই সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে এবং মনের দিক থেকে প্রস্তুত করে তুলছে।

## *৪র্থ ইঙ্গিতঃ*

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে বিজয় দান করার পুর্বে তাদেরকে অবশ্যই অনেকগুলো স্টেশন অতিক্রম করতে হবে। একটি ট্রেন যেমন তার চুড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে আরো অনেকগুলো স্টেশন অতিক্রম করে। ১ম স্টেশন ২য় স্টেশন ৩য় স্টেশন। এমন সেব স্টেশন অতিক্রম করে উম্মাহকে বিজয়ের পানে এগিয়ে যেতে হবে তার মধ্যে একটি হলো পরীক্ষার স্টেশন। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলেন

**أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ**

**তোমরা কি মনে করেছো তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে! অথচ আল্লাহ তায়ালা জেনে নেবেন না যে, তোমাদের মাঝে কে জিহাদ করেছে, কে আল্লাহ, তার রসূল এবং ঈমানদারদেরকে ছেড়ে অন্যদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি! তোমরা যা কিছুই করছো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুরই খবর রাখেন।** *(সূরা আত তাওবা, আয়াত ১৬)*

আয়াতে উল্লেখিত এই দুটি স্টেশন হলো সেসব স্টেশনসমূহের অন্যতম যা অতিক্রম করে দুনিয়াতে বিজয় ও আখিরাতে জান্নাত অর্জন করতে হবে। একটি হলো জিহাদ ফী সাবীলল্লাহ এবং অন্যটি হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারা। উম্মতের মধ্যে এই দুটি আমল কোন শ্রেণী নিষ্ঠার সাথে পালন করছে তা না দেখে আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই দুনিয়াতে তাদেরকে বিজয় দান করবেন না। উম্মাহকে অবশ্যই প্রমান করতে হবে যে তারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করছে এবং বাস্তব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে তাদের বন্ধুত্ব ও মিত্রতা আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং ঈমানদারদের সাথে ; একই সাথে এটাও প্রমান করতে হবে যে কাফেরদের সাথে তাদের কোনো প্রকারের মিত্রতা ও বন্ধুত্ব নেই, তাদের প্রতি কোনো আনুগত্য নেই ; বরং তাদের প্রতি রয়েছে ঘৃনা ও শত্রুতা।

অনেক আলেম ওলামা, ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিম জনসাধারণকে দেখা যায় যে তারা বিভিন্ন অজুহাতে এই দুটি স্টেশনকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়। তারা এই স্টেশনে আসতেই চায় না, অথচ বিজয়ের দিবা স্বপ্নে তারা বিভোর। তারা বুঝতে চায় না যে বিজয় অর্জন করতে হলে এই স্টেশন অতিক্রম করা ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় নেই। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা এই উম্মাহকে এখন এই পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন, আমরা প্রত্যেকে এখন এই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছি এবং আমাদের প্রত্যেককে এখন ঈমান অথবা কুফর দু 'টির যে কোনো একটিকে বেছে নিতে। আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে আমরা (সন্ত্রাস/জঙ্গিবাদ বিরোধী যুদ্ধের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধে) ঈমানদারদের পক্ষে, না কাফেরদের পক্ষে। এটা এখন পরীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই পরীক্ষার একটি প্রকৃতি হল এটা সমাজের শাসক ও নেতৃ স্থানীয় উচু শ্রেণী থেকে আরম্ভ হয় এবং একেবারে নীচু শ্রেণী পর্যন্ত সবাইকে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

শাসক শ্রেণীতে যারা রয়েছে তাদের পরীক্ষা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে; এবং তারা প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে কাফেরদের পক্ষ অবলম্বন করেছে। তাদের পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশিত হয়ে গেছে। এরপর আরম্ভ হয়েছে আলেম ওলামাদের পরীক্ষা, এখন তাদের পরীক্ষা চলছে; বিশ্ব তাগুত ও সকল তাগুতদের মুখপাত্র বুশ প্রকাশ্যে

ঘোষণা দিয়েছে "হয় আমাদের পক্ষে অথবা আমাদের বিরুদ্ধে"। বুশ সারা পৃথিবীর শাসকদেরকে পরীক্ষা করে নিচ্ছে এবং বলতে গেলে তারাই এখন গোটা দুনিয়াতে প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রি নিয়োগ করছে। আর এরা বিশ্ব তাগুতদের একান্ত বাধ্যগত ও অনুগত গভর্নর, পররাষ্ট্র মন্ত্রি কিংবা পুলিশ অফিসার হিসেবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কাগজপত্রে যদিও তারা স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ কিন্তু বাস্তবে তারা সকলেই বিশ্ব তাগুতদের নিয়োগপ্রাপ্ত গোলাম বৈ কিছুই নয়।

এখন আর মাঝামাঝি কোনো অবস্থান নেই, দুই নৌকায় পাড়া দেয়ার কোনো সুযোগ নেই, হয় আমাদের পক্ষে না হয় আমাদের বিরুদ্ধে। দশ বসর আগে হয়তো আপনি আপনার জুম য়ার খুতবায় জিহাদের প্রতি জনগনকে উদ্বুদ্ধ করে জালাময়ী বক্তব্য দেয়ার পরও রাতে প্রেসিডেন্টের সাথে ডিনারে অংশগ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু এখন আর তা মোটেই সম্ভব নয়। উভয় পক্ষের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলার দিন শেষ, এখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি কোন পক্ষে; এখন আর কোনো সাদা কালোর মাঝখানে গ্রে এরিয়া বলতে কিছু নেই, এখন হয় সাদা নয় কালো।

একারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা বলেছেন এই পরিক্ষা চলতে থাকবে যতোক্ষন না উভয়দল সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়[12]।

একদল নিফাকমুক্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার এবং অন্যদল ঈমানহীন নির্ভেজাল মুনাফিক কাফিরের দল। এখন তো মুনাফিক আর ঈমানদার সব একত্রে মিলে মিশে আছে , আর এ অবস্থায় বিজয় আসে না; বিজয়ের জন্য উভয় দল আলাদা হয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা ফায়সালা করেছেন যে বুশ এই পরীক্ষার একটা পক্ষ হবে। আর তাই সে গোটা উম্মাহকে এই পরীক্ষায় ফেলেছে যে তোমরা আমাদের পক্ষে, না মুজাহিদদের পক্ষে। অন্য দিকে মুজাহিদরা উম্মাহকে পরীক্ষায় ফেলেছে যে তোমরা কি মুজাহিদদের পক্ষে না কাফিরদের পক্ষে। এখন আপনাদের সামনে শুধু দু 'টো রাস্তা খোলা; হয় মুজাহিদদের পক্ষে যেতে হবে অথবা কাফিরদের পক্ষে যেতে হবে ; মাঝামাঝি কোনো রাস্তা নেই। এটাকেই আমেরিকানরা বলে থাকে **ব্যাট্‌ল অব দ্য হার্টস এন্ড মাইন্ড।** এই লড়াই হক্ব এবং বাতিলের লড়াই, এখানে ইতস্ততঃ করার কিছু নেই। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন-

**وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ**

**আর যারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে, তাঁর রসূলকে এবং ঈমানদারদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে (তারাই হলো আল্লাহর দল), আর আল্লাহর দল নিশ্চিতভাবেই বিজয়ী হবে।** *(সূরা আল মায়েদা, আয়াত ৫৬)*

---

[12] *শায়খ আওলাকী এখানে তার উল্লেখিত হাদীসের রেফারেন্স উল্লেখ করেননি, তবে তার এ বক্তব্যের সমর্থনে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা কিছুতেই ঈমানদারদেরকে তারা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থার উপর ছেড়ে দিবেন না যতক্ষন না পবিত্র (ঈমানদারদের) থেকে অপবিত্র (মুনাফিকদেরকে) আলাদা করে ফেলবেন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯)*

অতএব এই উম্মাহ্ বিজয়ী হতে পারবে না যতোক্ষন পর্যন্ত তারা আল্লাহ তাআলা, তার রসূল এবং ঈমানদারদের প্রতি প্রকাশ্যে ও মনেপ্রানে মিত্রতা পোষণ করা না হবে।

পাঠকদের স্বরণের জন্য মনে করিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা যদি উম্মাহর খারাপ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চান তাহলে তিনি এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরী করে নিবেন। এ মুলনীতির প্রমানে আমরা তিনটি বাস্তব ভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করেছি। মদীনার আওস ও খাযরাজের বুয়াস যুদ্ধ, পারস্য সাম্রাজ্যে সাথে যুদ্ধের সময় সংঘটিত ঘটনা এবং সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহঃ এর সময়ের ঘটনা। আমরা আরো বলেছি যে-

1. ইতিহাসের পনরাবৃত্তি ঘটে
2. আল্লাহ কিছু বিশেষ অঞ্চলকে প্রস্তুত করছেন
3. পশ্চিমা বিশ্বে মৌলবাদী চরমপন্থা বাড়ছে
4. উম্মাহকে বিজয় অর্জন করতে হলে অবশ্যই এমন কয়েকটা স্টেশন অতিক্রম করতে হবে যেগুলো পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই

## উম্মাহ্‌র বর্তমান দুরাবস্থা থেকে উত্তরনের উপায়ঃ

আমরা সকলেই একথা এক বাক্যে স্বীকার করি যে আমরা অনেক সমস্যায় আছি, আমরা গোটা মুসলিম উম্মাহ ভয়াবহ সমস্যা ও মারাত্মক খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় পার করছি। কিন্তু যখনই আমরা এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ সম্পর্কে আলোচনা করতে বসি তখনই আমরা একেকজন একেক ধরণের বক্তব্য উপস্থাপন করতে থাকি, একেকজন একেক মত পেশ করতে থাকি। কিন্তু আমরা সকলে যদি কোরআন ও সুন্নাহকে মেনে নিতে সম্মত হই তাহলে আমাদের এই মতের ও পথের কেনো পার্থক্য তো থাকার কথা নয়। আমরা সকলে আমাদের প্রশ্নের জবাব যদি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে গ্রহন করতে সম্মত হই তাহলে আর মতপার্থক্যের কোনো সুযোগ থাকে না। তাহলে আসুন আমরা জেনে নিই আমাদের এই দুরাব স্থা থেকে উত্তরণের জন্য আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আমাদের এই দুরাবস্থায় পতিত হওয়ার কারণ এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় প্রসংগে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

**إذا تبايعتم بالعِيْنَةِ وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذُلاً ، لا يَنزعه شيءٌ حتى ترجعوا إلى دينكم**

**"যখন তোমরা কেবল ব্যবসা বানিজ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, গরুর লেজের (দুনিয়ার) পিছনে ছুটবে, ক্ষেত খামারী কৃষি কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। আর ততোক্ষণ তিনি এই লাঞ্ছনা তুলে নিবেন না যতোক্ষন পর্য ন্ত তোমরা তোমাদের আসল দ্বীনে (জিহাদের পথে) ফিরে আসবে"।**[13]

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসটিতে আমাদেরকে সমস্যা, সমস্যায় পতিত হওয়ার কারণ ও তা থেকে উত্তরণের উপায় সুষ্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। আজকাল আমাদের এই সমস্যা র বিষয়ে আলোচনা করতে বসলে একেকজন একেক বিষয়কে সমস্যা হিসেবে তুলে ধরেন এবং নিজের মনগড়া সমাধান দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু যারা আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এই দুরাবস্থার কারণ ও তার সমাধান জানতে আগ্রহী তাদের জন্য এই একটি হাদীসই যথেষ্ঠ। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন আমরা যখন ব্যবসা বানিজ্য, ক্ষেত খামারী, গরু বাছুর তথা দুনিয়া কা মাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বো এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দেবো তখন আমাদের কপালে অপমান অপদস্থ, লাঞ্ছনা গঞ্জনা ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই জুটবে না।

আজকাল তথাকথিত মুসলমানদের অনেককে বলতে শোনা যায় যে মুসলমানদের এই দুরা স্থার কারণ হলো মুসলমানরা আধূনিক জ্ঞান বিজ্ঞান তথ্য প্রযুক্তি, জ্ঞান গবেষনা, উৎপাদন ও শিল্প কল কারখানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে

---

[13] *হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও সহীহ আল জামে' গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে, শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ তার মাজমুয়াতুল ফতোয়া গ্রন্থে এর সনদকে উত্তম বলেছেন, হাদিস বিশারদ ইমাম আহমাদ শাকের শরহে মুসনাদেও একে সাহীহ সাব্যস্ত করেছেন, ইমাম আলবানী সহীহ আবু দাউদে একে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।*

পিছিয়ে পড়া। মুসলমানরা যদি অন্যান্য জাতির মতো এসব ক্ষেত্রে প্রভুত উন্নতি সাধন করতে পারতো তাহলে মুসলমানরা অনেক উন্নত জাতিতে পরি ণত হতো।

অনেককে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে শেনা যায় মুসলমানরা যদি (কাফেরদের ভাষায়) সন্ত্রাসবাদ/জঙ্গিবাদ (ইসলামের ভাষায় জিহাদ) থেকে নিজেদেরেকে দুরে রাখতো এবং নিজেদেরকে ব্যবসা বানিজ্য ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়নে নিয়োজিত করতো তাহলে তারা দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিতে পারতো। অথচ স্বয়ং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যমতে এটা সম্পুর্ন একটি ভুল, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য; শুধু তাই নয় বরং আমরা যদি এমনটি করি তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন। তিনি উল্লেখিত হাদীসে সমাধান বলেছেন আসল দ্বীনে ফিরে যাওয়া। হাদীস বিশারদগন এ হাদীসের ব্যখ্যায় বলেছেন এখানে আসল দ্বীনে ফেরৎ আসার অর্থ হলো জিহাদের পথে ফিরে আসা; জিহাদ সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াত ও হাদিস সমুহ একত্রিত করলে একথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে **"জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ ছেড়ে দেয়ার অপর নাম হল আল্লাহ দ্বীনকে পরিত্যাগ করা"।** জিহাদ মানে দ্বীন আর দ্বীন মানেই জিহাদ। অতএব আমাদের এই অবস্থার একমাত্র সমাধান হলো জিহাদের পথে ফিরে আসা।

ইবনে রজব আল হাম্বলী রহঃ বর্ণনা করেন যে সালাফদের কোনো এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো আপনি তো নিজ পরিবারের জন্য একটি খামার বানাতে পারেন, কিন্তু বানাচ্ছেন না কেন? তিনি বলেন, দেখ আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আমাকে খামার বানাতে পাঠাননি বরং খামারীদেরকে হত্যা করে খামার ছিনিয়ে নিতে পাঠিয়েছেন!

একারনেই ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন শুনলেন যে জর্দানের উর্বর ভুমি বিজয়ের পর সাহাবায়ে কেরামগনের কেউ কেউ জিহাদ ছেড়ে দিয়ে জমি চাষাবাদে লেগে গিয়েছেন তখন তিনি মারাত্মকভাবে রেগে গেলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন ফসল পাকে, তারপর যখন সে জমির ফসল পেকে আসলো তখন তিনি তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন। সাহা বায়ে কেরামদের কেউ কেউ যখন তার কাছে অভিযোগের শুরে কথা বলছিলো তখন তিনি বললেন, দেখো জমি চাষাবাদ করা ইহুদী নাসারাদের কাজ, তোমাদের কাজ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর দ্বীনকে প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করা। তোমরা এই চাষাবাদের দায়িত্ব ইহুদী নাসারাদের ওপর ছাড়ো, তোমরা আল্লাহর দ্বীনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে বেরিয়ে পড়ো, তারাই চাষাবাদ করে তোমাদেরকে খাওয়াবে, তারা জিযিয়া দিবে, তারা খেরাজ দিবে সেগুলো তোমরা খাবে। তোমরা কি দেখো না যে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

**وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الصغار والذلة على من خالف أمر**

আমার রিযিক আমার তলোয়ারের ছাঁয়া তলে, আর যারা আমার বিরোধিতা করবে তাদের ভাগ্যে অপমান ও লাঞ্ছনা অবধারিত।[14]

---

[14] *মুসনাদে আহমাদে ইমাম আহমাদ রহঃ সহীহ সনদে ইবনে ওমর রাঃ এর বর্ণনায় দুটি সনদে হাদিসটি সংকলন করেছেন, এর একটির হাদীস নাম্বার হল ৫১১৪ এবং এর রাবীগন হলেন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ, ইবনে সাওবান, হাসসান ইবনে আতিয়াহ ও আবু মুনীব আল জুরাশী। অপর সনদের বর্ণনাটি দু'বার এসেছে যার নাম্বার যথাক্রমে ৫১১৫ ও ৫৬৬৭, এই সনদে সাওবান রহঃ এর পূর্বে দু'জন রাবী রয়েছেন, তারা হলেন যথাক্রমে আব্দুর রহমান ইবনে সাবিত ও আবুন নাযার।*

অতএব আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিযিক যদি গনীমতের মাধ্যমে আসে তাহলে নিশ্চয়ই গনীমাতের মাধ্যমে আসা রিযিক সর্বোত্তম রিযিক। অবশ্যই তা ব্যবসা বানিজ্য, চাষাবাদ গবাদি পশু পালন ইত্যাদির দ্বারা উপার্জিত রিযিকের চেয়ে উত্তম।

কিছু দিন আগে ইরাকে যুদ্ধরত মুজাহিদ গ্রুপ জাইশ আল ইসলাম ফিল ইরাক এর মুখ পাত্রের একটি ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছিলো; তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে আপনাদের অর্থনৈতিক উৎস কি? তিনি বলেছিলেন **'আমাদের অর্থনৈতিক উৎস হলো গনীমাত, তবে মুসলমানরা যদি আমাদেরকে কোনো সহযোগিতা করে তাহলে আমরা তা স্বাদরে গ্রহন করি।'** তারা মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করবে না, তারা গনীমাত দিয়ে তাদের জিহাদের অর্থের প্রয়োজন পুরণ করবে।

অতএব সব শেষে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে উম্মতের যাবতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, উম্মাহ যখন এই একটি আমলের উপর উঠে যাবে, এই ইবাদাতটি যখন সঠিকভাবে আরম্ভ করবে, যখন এই পথে উম্মাহ অটল অবিচল দাড়িয়ে যাবে তখন তাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। লোকেরা জিহাদকে ভয় পায় কারণ তারা মনে করে জিহাদ করতে গেলে জান মাল খোয়াতে হয়।

কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তব কথা হলো উম্মাহ যখন আল্লাহর পথে জিহাদরত থাকে তখন উম্মাহ সম্পদশালী হয় এবং তারা সবচেয়ে কম সংখ্যক নিহত হয়।

আমরা যদি উম্মাহর মৃত্যুর আনুপাতিক হার দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে উম্মাহ যখন আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তখন তাদের নিহতের আনুপাতিক হার ছিলো খুবই কম , অথচ তারা যখন জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে তখন উম্মতের মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ কুফফারদের হাতে নিহত হয়েছে । যদি অর্থনৈতিক অবস্থার উপর জরিপ চালাই তাহলে দেখতে পাই, উম্মাহ যখন আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তখন উম্মাহ সব চেয়ে সম্পদশালী হয়েছে, আর যখন উম্মাহ আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দিয়েছে তখন তারা সবচেয়ে দরিদ্র জাতিতে পরিণত হয়েছে।

ইসলামি রাষ্ট্রের মতো এমন জনকল্যাণকর রাষ্ট্র ইতিহাসে দ্বিতীয়টি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না । ইসলামী রাষ্ট্র কখনো তার মুসলিম জনগনের উপর কোনো ট্যাক্স আরোপ করেনি। কিভাবে তারা কোনো রকম ট্যাক্স ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে? কারণ যাকাত ছাড়াও এই রাষ্ট্রের রাজস্বের প্রধানতম উৎস ছিলো জিযিয়া, খেরাজ, গনীমাত এবং ফাঈ, আর এই সকল উপার্জনের মুল উৎস হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। আর বর্তমান মুসলিম উম্মাহ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ছেড়ে দিয়েছে এবং এর পরিণামে তারা তাদের জনগনের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়েছে; অথচ ইসলামী শরিয়াতে **"সকল প্রকার ট্যাক্স হারাম এবং ট্যাক্স সংশ্লিষ্ট কোনো কাজে যারা নিয়োজিত থাকে তারা প্রত্যেকে অভিশপ্ত"।**[15]

[15] *যদিও শায়খ এখানে 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন' বলে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন কিন্তু তাহকীকের সুবিধার্থে আমরা এখানে 'ইসলামী শরিয়াতে' বলে উপস্থাপন করেছি; আর একথা সর্বজনজনবিদিত যে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ট্যাক্সের নামে জনগনের সম্পদ লুন্ঠন করা সম্পূর্ণরুপে হারাম, ট্যাক্স ইসলামের দৃষ্টিতে এতই জঘন্যতম নিকৃষ্ট কাজ যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য আখ্যা দিয়েছেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিই ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় এক মহিলা ব্যভিচার করার পর এতই অনুতপ্ত হন যে তিনি আল্লাহ্র রসুলের কাছে এসে তার গুনাহের কথা স্বীকার করেন যাতে তার উপর আল্লাহ্র বিধান (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা) কায়েম করা হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা আখিরাতে তাকে মাফ করে দেন, এই মহিলার ব্যপারে রসুলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 'সে এমন তাওবা করেছে যে অন্যায়ভাবে ট্যাক্স আদায়কারীরাও যদি এভাবে তাওবা করত তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকেও মাফ করে দিতেন' (সহীহ মুসলিম হাদিস নং ৩২০৮) সহীহ মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ব্যখাকার ইমাম নববী রহঃ এই হাদীসের ব্যখ্যায় বলেন 'আল্লাহ্র রসুলের এ বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে ট্যাক্স (আরোপ ও আদায়) এমন একটি জঘন্যতম কবীরা গুনাহ যা মানুষকে অবধারিতভাবে জাহান্নামী করে দেয়।*

এটাই হলো মুসলিম উম্মাহর যাবতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান , আমাদের শুধু ছোট্ট এই হাদীসখানির মর্ম উপলব্ধি করা উচিত এবং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে ঝাপিযে পড়া উচিৎ।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন!!!